নেহরু বাল পুস্তকালয়

সোনার জলের ঘড়ি

অধীর বিশ্বাস

ছবি

দেবব্রত ঘোষ



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-3436-9

প্রথম প্রকাশ : 2001 (শক 1923)

মূল্য : 9.00 টাকা

Sonar Jaler Ghori *(Bangla)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

এ-5 গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110001 কর্তৃক প্রকাশিত

এক

দড়ি পরানো বাকি শুধু রতনেরই। অন্যদের চেয়ে ওর বয়স অনেক কম। টিকিট চেকারদের ঘরে একগাদা মানুষ ধরে রাখা হয়েছে। লোহার দরজা। ঘরে কোনও জানালা নেই। পুলিশ ঘরে ঢুকে কায়দা করে সবার কোমরে দড়ি বাঁধছিল। ওর কাছে এসে বলল, 'হাত তোলো, খোকা!'

অন্য সময় হলে এমন ডাকে রেগে উঠত রতন। ওর এখন চৌদ্দ। ক্লাস এইট। হয়তো না-শোনার ভান করে থাকত। কিন্তু এ সময় ও নিরুপায়। হাত তুলে দাঁড়াল। ও জেনেই গেছে, কী হতে যাচ্ছে।

অন্য পুলিশ, যার হাতে সেলাই করা কাগজের খাতা, সেই খাতা দেখে বলল, 'তোমার নাম কি রতন বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ।' রতন হাত-তোলা হয়েই জবাব দিল।

'বাড়িতে বাবা বকেছিল?'

সারা শরীর রোমাঞ্চিত। বুক নাক দিয়ে হঠাৎই এক ধরনের ফোঁপানি। দুই চোখ ঝাঁপিয়ে জল বেরিয়ে এল। ঠোঁটটা কামড়ে ধরে মাথা নিচু করে থাকে। খাতা-হাতের পুলিশ আর কিছু জিজ্ঞেস করে না।

'আর কেউ!' দড়ি বাঁধা শেষ করে বলল পুলিশটা।

খাতা-হাতে পুলিশ চোখ তুলে এক এক করে মাথা গুণে বলে, 'না। এগারোজন কমপ্লিট।'

বাইরে-বসা পুলিশটিকে বলল, তালা খোলো, চক্রবর্তী। 'সব রেডি তো?'

খাতা হাতে পুলিশের কথা শুনে চক্রবর্তী বলল, 'হ্যাঁ, দুজন বন্দুকধারীই থাকবে।'

'এই ভাই, এক এক করে বেরোও।'

প্রথমেই বেরিয়ে এল রতন। হাতে হাওয়াই চটি। সেফটিফিন লাগানো



সামনে একজন বন্দুকধারী। পিছনে আর একজন।

চটিজোড়া দেখে এক পুলিশ বলল, 'ওটা ফেলে দে। যেখানে যাচ্ছিস ওসব নিয়ে ঢুকতে দেবে না।'

রতন চটিজোড়ার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। রেল হাজত থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশে আমগাছটার গোড়ায় ছুঁড়ে দিল। কলকাতায় আসার পর এই প্রথম খালি পায়ে হাঁটছে সে। সামনে একজন বন্দুকধারী। পিছনে আর একজন। পাশ দিয়ে যাচ্ছে খাতা-হাতে সেই পুলিশ। রতন একদম সামনে। পিছনে তার থেকে একটু বড় ছেলে। একতলা দুতলা তিনতলা বাড়ি। বাড়ির বারান্দায় মানুষজনের চোখ। রাস্তার পাশেও লোকজন দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। রতন নিচু হয়ে পায়ের দিকে তাকিয়ে হেঁটে যায়। ওরা যাবে জেলা সদরের জেলে।

জেলে যাওয়ার জন্য ওর একদম কষ্ট নেই। রতন তো কাল রাত থেকেই মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল ভোর হলে দু'চোখ যেদিকে যায়, চলে যাবে। দূর দেশের অচেনা জায়গায় গিয়ে চায়ের দোকান কিংবা কোনও বাড়িতে 'চাকরের' কাজ করবে। সেখানে আর যাই হোক বাড়ির মতো বকা কিংবা মার খাবে না। মা থাকলে হয়তো আদর করত। তার হয়ে দুটো কথা বলত। কিন্তু মা-ই যখন নেই!

সকালে রেল পুলিশরাই শালপাতা করে কচুরি আর তরকারি দিয়েছে। এখন পর্যন্ত তেমন খিদে পায়নি। জেলে গেলে রাতের বেলাও কি তাদের জন্য দোকানের খাবার আসবে?

খারাপ লাগছে শুধু শহরের এই বড় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে। অনেকক্ষণ নীচের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ওপরের দিকে চাইতেই দেখল, বাঁদিকের বাড়িটার ছাদ থেকে একটা মেয়ে তাকিয়ে আছে। রতন মাথা নামিয়ে নিল। কয়েক পা যাবার পর আবার দেখল। মেয়েটি দেখছে এখনও। ও হয়তো চোর ভাবছে সবাইকে। ঠিক তক্ষুণি দড়ি-হাতে পুলিশটা তাড়া দিল—'এই ছেলে, পা চালাও।'

কথাটা শুনে তার খারাপই লাগল। সে তো সব কথাই মেনে চলছে। টিকিট চেকার যখন বললেন, 'টিকিট?' রতন বলেছিল, 'নেই'। তারপর গাড়ি থেকে নামিয়ে বললেন, 'পঞ্চাশ টাকা ফাইন আর ভাড়া।'

পকেটে দুই টাকা তিরিশ। তার কাকার মতো বয়সের সেই চেকার

বললেন, 'প্রথমেই ফাঁকা।' বোধহয় রেগে গেছিলেন। রতনের হাত ধরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো এক বন্দুকঅলা পুলিশের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'কেসটা আমার নামে।'

রতন ভোরবেলায় গাড়িতে উঠে ভেবেছিল, ট্রেনটা যেখানে শেষ সেখানে যাবে, সেই স্টেশনেই নেমে পড়বে। তারপর দোকানে দোকানে জিজ্ঞেস করা।—আমাকে কাজে নেবেন? আমার কেউ নেই। মন দিয়ে কাজ করব। কিন্তু তা আর হল কই? আচ্ছা, জেলে কদিন থাকতে হবে? এক মাস, নাকি দুই মাস? তারপর তো একদিন ছাড়া পাবেই! তখন এই শহরেই একটা কাজ জুটিয়ে নেবে। এখানে বড় বড় দোকান। বড় বড় অনেক বাড়ি।

সেই বাড়িটা পিছনে ফেলে এসেছে। মেয়েটা বোধহয় এই দলটাকে পুরো দেখতে পাচ্ছে। হয়তো ভেবেছে, এরা সব চুরি-ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এই ছেলেটাও হয়তো এক চোর। যাক, ভাবুক। পুলিশটার কথা মেনেই তাড়াতাড়ি পা চালায় রতন। আবার বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ধমকও খেল সে। 'কী, খোকা, বেশি ব্যস্ত যে!'

আগেও দোষ, পিছনেও দোষ। এবারও সে চুপ করেই রইল। নজর এবার পুলিশটার পায়ের গতিতে। পুলিশটা যেভাবে পা ফেলছে, রতনের পা তেমন তালেই। এমনভাবে চললে কিছুতেই তাড়া দিতে পারবে না।

এর আগে জেল দেখেনি সে।

জেল মানে হয়তো চারদিকে পুলিশ। হাতে বন্দুক। বাবার কাছে শুনেছে, জেলে গেলে কাজ করতে হয় চোর-ডাকাতদের। কিন্তু সে তো চোর-ডাকাত নয়। বাড়ির কেউ কি দেখতে আসবে কোনও দিন? কেউ কি জানবে? হয়তো না। তবু ভাল।

বাবা দাদা কিংবা বউদি—এরা তো খোঁজই পাবে না যে জেলে তাদের রতন বন্দী! চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসে। চোখের দৃষ্টিতে এখন শুধুই হিজিবিজি।

দুই

টালির চাল আর উঠোনের শুকনো পেয়ারা গাছটার ডালে বসে পাতিকাকগুলো ডেকেই চলেছে। রতনের বড় বউদির ঘুম এমনিতেই আলগা। অন্যদিন এই ভোরে আর একটু শুয়ে থাকতেন। ওদের বিশ্রী ডাকে উঠে বসলেন। ঘর থেকে বারান্দায়।

এতগুলি লোকের রাতের বিছানা পাতার জন্য উঠোনে বলা যায় এখন একটুকুও খালি জায়গা নেই। একপাশে বাড়িঅলির কয়লার বস্তা। কয়লা ভাঙার লোহার রড আর পাশেই পাথর একটা। সারা দিনের এঁটোকাটা আর নোংরা মিশে ঘরের সামনের চৌকো নর্দমাটা প্রায় ফুলে আছে। তবু এই গন্ধের মধ্যেই সবাই ঘুমিয়ে।

এতক্ষণ নাকে কাপড় ছিল বউদির। সরিয়ে নিলেন। নাকে কাপড় দেওয়াও বুঝি অস্বস্তির। নাকেমুখে কাপড় থাকলে যে ভাবনার জন্য মন আকুল তাতে বাধা আসে। রতনের চিন্তার চেয়ে তার কাছে গন্ধ ঠেকানো জরুরি নয়। সত্যি, ছেলেটার কী অভিমান! হবেই। সেই বয়সের শুরু তো এখনই। ভাবেন, না, বেশি বকা দেওয়া যাবে না। কোথা থেকে কী হয়ে যায়। শাশুড়ির কথা মনে পড়ে। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মা বলা যায় হাতে তুলে দিয়ে গেছিলেন ওকে। বলেছিলেন, 'এ শুধু তোমার দেওর নয়, ছেলে।' সেই কর্তব্য তাঁকে সারা জীবন করে যেতে হবে। কর্তব্য পালনের জন্য সত্যি, এক রাত্তির কাছে নেই, এ কী মন খারাপ!

কিন্তু বাবা, ওর বড়দা ছোড়দা কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে উঠোনটায়! এই মুখগুলো দেখলে কিছুতেই বোঝা যাবে না ওর জন্য কোনও চিন্তা আছে। মনে হয় দুষ্টুটা বাড়ি থেকে দূর হয়েছে না ভাল হয়েছে। যেন লেখাপড়ার খরচ, একজনের খোরাকি কমে যাওয়া দারুণ স্বস্তির।

এমনভাবে বসে রতনের কথা বললে ওর বাবা বা দাদা ধমক দেবে ঠিক। হয়তো বলবে, বেশি দরদ দেখালে, তোমাকেও—। বউদি ঠিক করলেন রুটি করার সময় একবার বলবেনই, 'যাও না, একবার খুঁজে এসো।'

কোথায় খুঁজতে বেরোব! আশেপাশে কোনও আত্মীয়স্বজন নেই যে সেই বাড়ি গিয়ে বলব, রতন এসেছে?

তবু যদি কোনও বন্ধুর বাড়ি থেকে থাকে।

না, না। বন্ধু হবে কোথায়? নতুন মানুষ আমরা। আমাদের কেউ চেনে না। তুমি নিজের কাজ করো। যার দরকার সে নিজেই আসবে। মনে রেখো : খিদের বড় জ্বালা। দুই হাঁটু নড়বড়। কানে লাগে তালা।

বউদি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পান, রতনের কথা বললে এমন কথার বাণে ঘায়েল হবেন।

কাকগুলোর ডাক শুনলে গা জ্বলে যায়। চেহারাতেও যেমন ডাকেও তেমন। কা-কা। গ্রাম থেকে এই শহরে আসার পর একদিনও দাঁড়কাক দেখা যায়নি। কেন, কে জানে! আবার দেশে থাকতেও এমন কাক বোধহয় কেউ দেখেনি। যেমন দেখা যায়নি কোনও হিন্দি লোক। এখানে এসে জল বাসস্থান ভাষা একেবারেই উল্টো। বউদিরও এসব মানিয়ে নিতে কষ্ট। রতন তো মাঝে মাঝেই দেশে ফিরে যাবার কথা বলে।—'চলো না বউদি, একবার বেড়াতে যাই।'

'যাব বললেই কি যাওয়া যায় রে? কত কাজ এখন। তা ছাড়া ভাড়া। অনেক টাকা।' বলেছিলেন, 'ওর চেয়ে মনকে বুঝিয়ে থেকে যা। চিরদিন এখানেই থাকতে হবে, রতন।'

অনেকদিন হল রতন দেশের বাড়ি যাওয়ার নাম করে না। হয়তো জেনে ফেলেছে এটাকেই তার নিজের দেশ ভাবতে হবে।

শহরে এসে খুব একা হয়ে গেছে রতন। বাবা বলেন, কিছু পয়সাকড়ি জমিয়ে দু' এক কাঠা জমি কিনতে হবে। সেখানে কুঁড়েকাড়া যা হোক মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই করে দিতে পারলে শান্তি। খেতে খেতে বাবার এমন স্বপ্নের কথা শুনে রতনের কী আনন্দ। 'আমাদের বাড়ি হবে, বাবা?'

'হবে না কেন? তোরা মিলেমিশে থাকলে সব হবে।'

রতন খাওয়া থামিয়ে বলে, 'বাড়িটার একটা সুন্দর নাম দেব।'

সুন্দর করে হাসেন বাবা। কতদিন সে এমন হাসি দেখেনি বাবার! বাবা বলেন, 'এমন ভাবনা কোথায় পেলি তুই?'

'স্কুলে যেতে কত বাড়িতে নাম লেখা থাকে। কোনও বাড়িতে সিমেন্ট দিয়ে 'শান্তি'। একটা বাড়ির গেটে টিনের বোর্ডে 'নিরালা' লেখা।

যেন এমনিই বলেন, 'তোর নামটা কী, শুনি!' রতন মাথা নিচু করে

বলেছিল, 'চারু নিকেতন।'

নামটা শুনে বাবার বুঝতে বাকি থাকে না। বলেন, 'তুই—।'

'হ্যাঁ, বাবা। খারাপ হবে?'

'খারাপ কেন? তোদের বাড়ি। তোদেরই দেওয়া নাম থাকবে। কিন্তু তোর মায়ের নামের সঙ্গে কার নাম বললি যেন!'

'নিকেতন। নিকেতন কারও নাম নয়, বাবা, 'নিকেতন' মানে গৃহ।'

বাবা আর কিছু বলতে পারেন না। তাকিয়ে রইলেন রতনের দিকে।

বউদি বললেন, 'কী সুন্দর ভেবেছে না, বাবা?'

বাবা এবারও উত্তর কবলেন না কোনও। চোখে মুখে দুঃখ আর আনন্দ মেশানো এক চিলতে হাসি শুধু।

বউদি উঠতে যাবেন, এমন সময় বাড়িঅলার ঘরের ঘটাঙ শব্দ পেয়ে তাকান ওদিকে। বাড়িঅলি জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁ গো, রতন কাল এয়েছিল'।

'না, মাসিমা। কোথায় যে গেল ছেলেটা!'

'বলিহারি বাপু, কী দরকার ছিল সবার মধ্যে চুল টেনে ওইভাবে ঘরে ঢোকানোর?—যাই বলো, ও তেমন অন্যায় করেনি কিন্তু।'

যেন এক সহায় পেলেন বউদি। 'আপনি ওর বড়দাকে একটু বলবেন। আপনার কথা ফেলতে পারবে না। কোথায় আছে, কী খেয়েছে—।'

'বলবো। ঘুম থেকে উঠুক।'

আর দেরি করেন না। তাড়াতাড়ি উনুন ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন বউদি। পোড়া কয়লা বেছে ছাই নিয়ে বাইরের ডাস্টবিনে ফেলতে যান। গোলাকার টিনের ডাস্টবিনটা দরজার পাশেই। যতবারই ওর মধ্যে কিছু ফেলতে যান তখনই ওর গায়ে 'ময়লা ছুঁইলে শাস্তি' লেখাটা চোখে পড়বেই। বউদি তাই কাছে গিয়ে ভাঙা ডিশের ছাই উঁচু করে ছুঁড়ে দেন। প্রথম প্রথম ভয় করত। কী জানি, শহরের কী নিয়ম। কতবার ভেবেছেন, জিজ্ঞেস করবেন, ডাস্টবিন ছুঁলে কী শাস্তি হয় গো? কিন্তু আর জানা হয়নি। জিজ্ঞেস করতে গেলে হয়তো এরা বলবে, কী গেঁয়ো-বউ রে বাবা। তাই ডাস্টবিনের সামনে যতবারই যান, লেখাটা চোখে পড়ে। কিন্তু আজ মনটা এত ব্যস্ত যে ওসব দিকে না তাকিয়ে ঢেলেই চলে আসেন। ঘরে ঢুকে রতনের বড়দাকে ধাক্কা দিয়ে বলেন, 'তোমাদের কি এতটুকু চিন্তা হচ্ছে না

রতনের জন্য?’ রতনের বড়দা চোখ মেলে উত্তর দেন, ‘আমি কী করব। বড্ড পাকা হয়ে গেছে। যাক, ঘুরে আসুক। দেখুক, দুনিয়াটা কত শক্ত জায়গা।’ বলেই আবার চোখ বন্ধ করেন।

বউদি কোনও কথা বলেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকেন। বড়দা বলেন, ‘কী করতে বলো?’

‘কী বলব, খুঁজে দেখবে না তাই বলে?’

কাল রাতেও যে-বাবা রেগে ছিলেন এখন শুনে আর রাগলেন না। আবার এ প্রসঙ্গেও কিছু বললেন না। যেন ইচ্ছে করলে ওর বড়দা যাক— অর্থাৎ কালিদাস। কিন্তু খুঁজবে কোথায়?

বড়দা উঠে চোখমুখে জলের ছিটি দিয়ে জামাটা পরতে যাবেন, এমন সময় বউদি বলেন, ‘আজ কাজে যাবে?’

‘যেতে হবে। কাজের জায়গায় গিয়ে বলে আসি, বাড়িতে বিপদ। ছোট ভাইকে পাওয়া যাচ্ছে না।’

‘তাই যাও। আমার কিছুই ভাল লাগছে না।’

‘কিন্তু মালিক—।’ কথা কেড়ে বউদি বলেন, ‘খুব অসুবিধে হবে? যাক না হয় একদিনের রোজ।’

‘আরে তা না। বাড়ি পাহারার কাজ তো! জিনিসপত্র ছড়ানো। একটা কিছু চুরি হলে—।’

রতনের বাবা এসব ব্যাপার এড়িয়ে কাজে মন দেন। বিছানার কুণ্ডলীটা নিয়ে চৌকির তলায় ঢুকে, শুধু বিছানাই নয়, খুটখাট শব্দ তুলে কী করেন যেন।

বাবা চৌকির তলায়। বউদির বুঝতে বাকি থাকে না, তাঁর মতো বাবারও মন খারাপ। বলেন, ‘বাবা, আপনি কি অন্য দিকে যাবেন?’

‘আমি কোথায় কী চিনি? কালিদাসই যাক। তা ছাড়া লঙ্কাগুলো বিক্রি না হলে পচে যাবে। বর্ষাকালের লঙ্কা। এক পাল্লার দাম অনেক।’

বড়দার জামা পরা হয়ে গেছে। বউদি বলেন, ‘কিছু খেয়ে যাবে না?’

‘না, খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। ছেড়ে দাও বউমা। রাস্তাঘাট থেকে যা হোক কিছু খেয়ে নেবে।’

এমনভাবে কতদিন তো না খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বউদি

বলেন, 'আমার কাছে গোটা চারেক টাকা আছে, দেব?'

'লাগবে না।'

রতনের বড়দা উঠোনে নামতেই বাড়িঅলি বললেন, 'কী গো ঠাকুরপো, খুঁজতে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

যেন নীরব উত্তর। বউদি বেরিয়ে এসেছেন। বাবাও। বাড়িঅলি কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'দুগ্গা, দুগ্গা!'

তিন

বড়দাকে দেখেই বন্ধু মঙ্গল জিজ্ঞেস করে, 'কী রে, একেবারে টেরি বাগিয়ে চলে এসেছিস যে! কাজে এলি তো? নাকি—।' ওদের পাহারার কাজ। এখানে ওখানে ছড়িয়ে রাখা লোহার রড়, সিমেন্টের বস্তা। তৈরি হতে থাকা এ বাড়ির দোতলা আর তিনতলার কাজ চলছে একসঙ্গেই।

মঙ্গলের কথা শুনে চুপ করে থাকেন বড়দা। অন্য সময় হলে ইয়ারকির জবাব ইয়ারকিতেই দিতেন। কিন্তু কিছুই না বলে সিঁড়ি ঘরের নীচে চটের বাণ্ডিল-করা বিছানার সুতলির বাঁধন খুললেন। খুলতেই মেলে পড়ল মাথায় দেওয়া বস্তার বালিশ আর একটা পাতলা চাদর। বালিশেও অসংখ্য সুতলির বাঁধন। খুলতে খুলতে আরও খুলে দশ টাকার দুটো নোট। মঙ্গল কাছেই দাঁড়িয়ে। 'কী ব্যাপার রে? ঝগড়া করেছিস বাড়িতে?'

'ওসব না, মঙ্গল।' বলেই হাঁটুমুড়ে বিছানাটা ফের বাণ্ডিল করতে থাকেন বড়দা।

'হয়েছে কী, বলবি তো!'

'কী আবার? তুই কি কিছু করতে পারবি?'

'না পারলেও বলা কি বারণ? যদি থাকে—।' বাকিটুকু না বলেই বড়দার গায়ে হাতে রাখে মঙ্গল।

চোখভরা জল নিয়ে তাকাল বড়দা। 'ভাই রতনকে পাওয়া যাচ্ছে না। পরশু বাবা বকেছিল একটু। রাগ করে কোথায় যে গেল! তাই খুঁজতে যাচ্ছি।'

'এতটা দেরি দেখেই মনে হয়েছিল একবার, তোর বাড়িতে কি অসুখবিসুখ করল কারও।'

'অসুখবিসুখ করলেও মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। কাছাকাছিই থাকে সে। কিন্তু এ যে কী কষ্ট। মা-মরা ছোটভাই!'

বড়দার সঙ্গী-পাহারাদার মঙ্গল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে, 'যা, খুঁজে আয়। ডিউটি নিয়ে ভাবিস না। বাবুকে বলে দেব। যা।'

আর দেরি করতে চান না বড়দা। মঙ্গলও বেশি কথা বলে ওকে বিব্রত করতে চায় না। সত্যি, কতটুকু ছেলে। মাঝে মধ্যেই ভাত দিতে আসে। হাসিভরা মুখখানা যেন। কোথায় যেতে পারে?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিল বড়দা। বাড়ির একতলা কমপ্লিট। মালিক খুব বড়লোক। বউবাজারে সোনার দোকান। কলকাতায় এটা নিয়ে নাকি চারটে বাড়ি হবে। বস্তিরই একজন পাহারার কাজ জোগাড় করে দিয়েছেন রতনের বড়দাকে। মালিক বলেছেন, মন দিয়ে কাজ করলে সারাজীবন রেখে দেবেন বড়দাকে।

বড়দা এগিয়ে যান। গায়ে কোঁচকানো জামা। এটা ছাড়া ভাল জামা আর নেই। কী মনে হতেই পিছন ফিরলেন। মঙ্গল তাকিয়ে ছিল। ডাক দেয়, 'কালিদাস, দাঁড়া।' কাছে গিয়ে বলে, 'যাচ্ছিস কোথায়?'

'তাই তো ভাবছি।'

'ভাবছি মানে?' মঙ্গল ধমকের গলায় বলে উঠল।

একটু চুপ থেকে বড়দা বললেন, 'আমাদের তো এ শহরে কেউ থাকে না। তবে শুনেছি দূর সম্পর্কের এক মাসির বাড়ি আছে কোনও গ্রামে।'

'মাথা ঠাণ্ডা করে ঠিক কর, কোথায় যাবি।'

দুম করে বড়দা বললেন, 'আচ্ছা, গড়ের মাঠ, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, হাওড়ার ব্রিজ—এসব জায়গায় গেলে কেমন হয়?'

'কী বলছিস, কালিদাস? এসব জায়গা তো কিছুক্ষণের জন্যে বেড়াতে যায় লোকে। দু'দিন ধরে—, তা ছাড়া থাকবে কোথায়, খাবে কী?'

বড়দা পাশের বাড়ির রাস্তা-লাগোয়া সিঁড়িতে বসে পড়েন।

মঙ্গল বলল, 'উতলা হোস নে। যা করবি, ভেবেচিন্তে কর। দুমদাম বেরোলে তো হল না, শুধু পয়সার শ্রাদ্ধ, কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

মাথা নিচু করে বড়দা বললেন, 'না, বলছিলাম, এসব জায়গায় ঘুরতে যাবার কথা বলত খুব। কিন্তু নিয়ে যেতে পারিনি। যদি ওসব জায়গার কোথাও—।'

'সে না হয় গেল। কিন্তু খাবে কী?'

ঝাঁ করে চোখে ভেসে উঠল রতন চিড়িয়াখানার সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ি থেকে নামা কাউকে বলছে, বাবু, দুটো পয়সা দেবেন, দু'দিন কিছু খাইনি। ও মা...। বড়দা ফুঁপিয়ে কেঁদে দিলেন।

'কী রে কাঁদছিস কেন?' গায়ে ধাক্কা দেয় মঙ্গল। 'এই রাস্তার পাশে বসে এইভাবে—।'

চোখ মুছে তাকান। 'কী যে করি!' এর মধ্যেই গলার স্বর একদম পাল্টে গেছে বড়দার। মোটা, ভারী আর জড়ানো।

বড়দার হাত টেনে মঙ্গল বলল, 'চল, বাড়ির মধ্যে চল। তারপর যা হোক ভাবা যাবে।'

বাধ্য ছেলের মতো উঠে পড়লেন বড়দা।

এই সকালেই শহরের রাস্তায় ব্যস্ততা জেগে উঠেছে। ঘন ঘন চোখে পড়ে কাগজ ভর্তি সাইকেলে খবরের কাগজ, দুধের জোগানদার। কর্পোরেশনের নোংরাতোলা গাড়ির ঘরঘর ঘরঘর। একটা কাক ইলেকট্রিকের পোস্টে এসেই ডাক জুড়ছে, কা কা। পাশের বাড়ির নেপালি দারোয়ান হাতে দুধ আর বাঁ বগলে ইংরেজি কাগজ নিয়ে কোলাপসিবল গেট লাগিয়ে তালা দিচ্ছে। বড়দাকে ধরে নিয়ে যাওয়া দেখে বললেন, 'কী হল, মঙ্গলভাই?

অনেকদিন এখানে থাকাতে নেপালি দারোয়ান বাংলাভাষা রপ্ত করে ফেলেছে। পাশাপাশি থেকে সম্পর্কটা অনেক কাছের। মঙ্গল বলল, 'এর ছোটভাইকে পাওয়া যাচ্ছে না দুদিন।'

'সে কী?' তালা হাতে অবাক চোখে বলল বাহাদুর।

দুজনই এবার মুখোমুখি। সিঁড়িঘরের পাশে। একতলার সব ঘরেই তালাবন্ধ। মঙ্গল কী বলবে এরপর, তারই আয়োজন করছে বোধহয়। কিন্তু ওর যা মনের অবস্থা, শেষে কালিদাসই না সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। 'চা খাবি, কালি?'

বড়দা মাথা নাড়ায় না। হঠাৎ করেই মনে পড়ল যেন মঙ্গলের। বলে, 'দাঁড়া একজনের কথা মাথায় এসেছে। মালিকের মেজোভাই কোন থানার যেন অফিসার।' বলেই হাতে তালি দিয়ে উঠল মঙ্গল।' তুই বসে থাক। আমি না ফেরা পর্যন্ত এক পা-ও নড়বি না।'

চোখ তুলে তাকাল বড়দা। যেন আশার আলো সামনে। মঙ্গল বলল, 'মালিকদের বাড়ি গিয়ে সব বলি। দেখিস, চারদিকে টেলিফোন করে তোর ভাইকে খুঁজে দেবে।—সত্যি, এতক্ষণ কেন যে মনে আসেনি!' মঙ্গলের মনটা দারুন উৎফুল্ল।

বড়দা আচমকাই জাপটে ধরে মঙ্গলের হাত দুটো। 'মাথা কোনও কাজ করছে না। বেরোতে হবে, বেরিয়ে পড়েছি। তুই আমার—।' বলেই ফুঁপিয়ে উঠলেন বড়দা।



মঙ্গলের ফেরা আর স্কুল বসার ঘণ্টা দুটোই প্রায় এক সঙ্গে।

'কালিদাস, এক্ষুণি যেতে হবে তোকে। তার আগে বাড়ি গিয়ে তোর ভাইয়ের একটা ছবি নিয়ে আয়।'

কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বড়দা। 'পাওয়া যাবে?'

'আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমি কি এমনি গেছি?'

'সত্যি, তুই না—। খুব কষ্ট দিচ্ছি তোকে। রাতভর ডিউটি দিয়ে এখনও বাড়ি ফিরলি না।'

'বিপদে-আপদে এটুকু তো করতেই হবে, কালিদাস।'

'কী বলব?'

'ওই যে, ছবি নিয়ে যেতে হবে। সব বলে দেবে মেজোবাবু। থানায় ডায়েরি করতে হবে। তারপর—।'

'আমি যে ওসবের কিছুই চিনি না। তা ছাড়া যদ্দুর জানি, রতনের আলাদা কোনও ছবি নেই। যা আছে সবাই আমরা একসঙ্গে। মায়ের মৃত্যুদিনে তোলা। মা মাটিতে শোওয়া। আমরা ঘিরে আছি। তার মধ্যে ও। তখন তো খুব ছোট। ওই ছবিতে হবে?'—বড়দা একটানা এতগুলো কথা বলে গেলেন।

মঙ্গল বলল, 'ঠিক জানি না। তবে নিয়ে যাওয়াই ভাল।'

'তা হলে বাড়ি যাই, কী বলিস?'

'যা। শিগগির চলে যা। মেজোবাবু বেরিয়ে যাবে কিন্তু। আমারও যাওয়া দরকার। বাড়িটা কত দূর বল তো! ওদিকে আবার—।'

বড়দা মঙ্গলের গা ছুঁয়ে দেয়। কিছু বলেন না, যেন তুই যা করছিস না!—'সর, গেটটা লাগিয়ে দিই। চাবিটা আমার কাছেই থাক, কী বলিস কালিদাস? ক'দিন তো মিস্ত্রিদের কাজ বন্ধ।'

'হ্যাঁ। তোর কাছেই থাক। আমার মাথার ঠিক নেই।'

রড় রাস্তার মোড় থেকে দু'জন দুদিকে যাবে। মঙ্গল যাবে ডান দিকে বাজারে, আর বড়দা বাড়ি ফিরবে। পাশেই স্কুলের দোতলা বাড়ি। গমগম করছে বাড়িটা। মঙ্গল হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, তোর ভাই তো এই স্কুলেই এইটে পড়ে?'

'হ্যাঁ।'

'স্যারদের কি একবার জানিয়ে রাখবি?'

ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না বড়দা। বলেন, 'এখনই জানানো ঠিক হবে?'

'থাক। তুই ঠিকই বলেছিস। তার আগে মালিকের সঙ্গেই দেখা করে আয়।'

হনহন করে চলে আসেন বড়দা। বস্তিতে ঢোকার মুখে বাণী বুক স্টোর, তার পাশেই ভাতু সাউয়ের খোল সারানোর দোকান। উল্টোদিকে তাকাতেই বাবাকে দেখতে পেলেন বড়দা। এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তা পার হচ্ছেন। ফুটপাথে পা রাখতেই বাবা বললেন, 'কালিদাস!' খোঁজ পেলি?'

'রতনের কোনও ফটো আছে ঘরে?'

ডানদিকের কাচটা একদম হিজিবিজি। চশমার বাঁ কাচেই যা দেখতে পান। ঘাড়টা তোলাই থাকে। মুহূর্ত ভাবেন। বলেন, 'দেখেছি বলে তো মনে হয় না। যা আছে সে তো তোদের মায়ের সঙ্গেই তোলা।'

'তা দিয়ে কি হবে?'

'কেন, ওর ফটো দরকার কেন?'



'কালিদাস! খোঁজ পেলি?'

'থানায় নিয়ে 'ডাইরি' করাতে হবে। সদরেও যেতে হবে।'

'সেটা কোথায়?'

'ওসব বুঝবে না, সত্যি যা বিপদে ফেলে দিল না!'

'কী আর করবি? ভাই তো!'

□

ঘরেও একই কথা। 'কী গো, খোঁজ পেলে?'

এ কথার জবাব না দিয়ে বড়দা বলেন, 'রতনের কোনও ছবি আছে?'

'ছবি দিয়ে কী হবে?'

'আছে কি না!' যেন সব দোষ বউদির। যেন চাপা আতঙ্ক। ও বাড়ি না ফেরার মধ্যে ছবির কী সম্পর্ক বউদি ঠিক ধরতে পারেন না। বলেন, 'না।'

'তবে মায়ের ছবিটাই দাও।'

বউদি আরও অবাক। কী সব বলছে। শরীর ভাল আছে তো?' এমনভাবে কথাবার্তা কখনও শোনেননি। বলেন, 'ছবিটা সুটকেসের মধ্যে।'

'শিগগির বের করো, তাড়াতাড়ি।'

রতনের বড়দার দুই ছেলে। লালু আর ভুলু। ওরা আজ স্কুলে যায়নি। সেজভাই দুলালকে দেখতে পান না বড়দা। এ নিয়ে কোনও কথা বললেন না। অন্যদিন হলে লালু ভুলুকে মারধোর শুরু করে দিতেন স্কুলে না যাওয়ার জন্য। সেজভাইয়ের কথা জানতে চাইতেন, কী গো, ও কাজে গেছে? রতনের এই দাদা একটা লেদের কারখানায় কাজ শিখছে। হাতখরচা মাসে ৫০ টাকা।

লালু-ভুলু ভয়চোখে ওদের বাবার দিকে তাকিয়ে। যেন মার দিলেই ভ্যাঁক করে কেঁদে দেবে। বেশ জোরেই হবে আজকের কান্নাটা। কেননা ওরা জেনে ফেলেছে ওদের কাকা কোথায় যেন চলে গেছে। আর আসবে না। ভুলুকে লালু জিজ্ঞেস করেছিল, কোনো দিনই আসবে না কাকা? ভুলু বলেছে, কী জানি! একবার বলতেও যাচ্ছিল, না, কোনও দিনই না। কিন্তু বলেনি। বললে যদি তার কথা ফলে যায়! যদি তাদের মনিকাকা সত্যিই না ফেরে!



হাতে ওর শাশুড়িমার ছবি।

বউদি খাটের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। হাতে ওর শাশুড়িমার ছবি। মনে পড়ে, মৃত্যুর পর শাশুড়িমার চোখ দুটো সবুজ আর নীলের মাঝামাঝি একটা রঙ হয়ে গেছিল। উনি চোখ মেলে শান্ত শুয়ে। কে যেন চোখর উপর দুটো তুলসীপাতা দিয়ে দিয়েছিল। কেন দিয়েছিল, জানেন না বউদি। ছবিতে তাই মায়ের চোখদুটো পরিষ্কার নয়। যেন চোখ আছে, দৃষ্টি নেই। ছবিটা দেখে হঠাৎ-ই মনটা কেমন করে উঠল বড়দার। ভাই হারানোতে মাকে দেখতে পাওয়া, মাকে মনে পড়া। বড়দা বললেন, 'আমাদের মালিকের ভাই পুলিশ অফিসার। ছবি চেয়েছেন। ওর ছবি দেখিয়ে দেবেন সব পুলিশকে। বলবেন, খুঁজে বের করো।'

এবার আশ্বস্ত। বউদি বললেন, 'যাও, তা হলে আর দেরি করো না।'

বিকেলবেলাটায় বাড়িঅলির লম্বা বারান্দায় ছোটখাটো একটা গল্পের আসর বসে। গল্প মানে, এ বাড়ি ও বাড়ির নিন্দেমন্দ। এমন সময় দুটো ছেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। খাঁকি প্যান্ট আর সাদা জামা। দু' জনেরই পিঠে স্কুলব্যাগ। হনহন করে ঢুকে বাড়িঅলির বারান্দার দিকে তাকিয়ে রতনদের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন বউদি। তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। বলেন, 'তোমরা রতনের সঙ্গে পড়ো?'

'হ্যাঁ? ওকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?' রোগা ছেলেটি বলল।

'তোমাদের কে বলল?'

'শুনেছি।' অন্য ছেলেটি বলল, 'আমরা কেন, সবাই শুনেছে। স্যাররাও।'

রোগা ছেলেটি বলে, 'ও আমাদের বন্ধু। আমার নাম মনু। এর নাম পাপু। আমরা তাই শুনতে এলাম।'

'এসো, ভেতরে এসো। লক্ষ্মী ছেলে তোমরা।'

'লক্ষ্মী' কথাটায় মন নরম বুঝি। দু'জনে দুজনের দিকে তাকিয়ে চটি খুলতে যাবে, তখনই বউদি বললেন, 'চটি পরেই উঠে এসো। বারান্দার কোণে খুলে রাখলেই হবে। নীচের নর্দমার জল খুব নোংরা।'

ঢুকেই মনু ঘরটাকে দেখতে লাগল। বলল, 'এত অন্ধকার!'

মৃদু হাসলেন বউদি। বলেন, 'এর মধ্যেই কষ্ট করে থাকি।'

'আপনি কি ওর মা?' পাপুর কথা শুনে বউদি একটুও অবাক হলেন

না। মা না, বউদি। ওর মা ছোটবেলায় মারা গেছে। এখন আমি বউদি, আবার মাও।'

কথাটা শুনে কেমন দন্দ লাগে ওদের। 'মা না বউদি'—এর উত্তরটা রতনের কাছেই জেনে নেবে। তাই কিছু সম্বোধন না করে মনু জানতে চায়, 'রতন পড়াশুনো করে কোথায়?'

'কেন, এই মাটিতে বসেই!'

পাপু বলে, 'ওর বই দেখছি না তো?'

'ওই যে, কোণার দিকে সেল্‌ফ। ওতেই সাজানো।'

পাপু এগিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চোখদুটো সয়ে এলে দেখে, পাতলা স্কেলের মতো কাঠের জোড়া দেওয়া তাক। বইয়ের ভারে ঝুলছে। বুঝি যে কোনও সময়ই পড়ে যেতে পারে। পাপু দেখছিল আর ভাবছিল, কত কষ্ট করে পড়াশুনে করে রতন। এমন একটা ঘর যেখানে বেশিক্ষণ থাকলে বুঝি শ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে। ও হারিয়ে না গেলে হয়তো কোনও দিনই ওদের এই ঘরে আসা হত না। একদিকে ভালই হল। পাপুর বার বার মনে হচ্ছে, লেখাপড়া খুব কষ্টের জিনিস। রতন কষ্ট করে, তাই ও লেখাপড়ায় ভাল। ও পরে এসে মনুকে বলল, 'চল, রতনের বাড়িটা চেনা হয়ে গেল। কাল স্যারকে বলব।'

'স্যার কি কিছু বলেছেন?'

'হ্যাঁ। পাপু বলল, 'পরেশ স্যার ক্লাশে ঢুকেই বললেন, ঘটনাটা শুনেছো? আমরা প্রায় সবাই বললাম, হ্যাঁ স্যার, শুনেছি।'

'আর কী বললেন স্যার?' বউদির আগ্রহ খুব।

'বললেন, রতনের বাড়ি গিয়ে একটু খোঁজ নেওয়া দরকার,—কী বলো? তারপর আমরা দুজনে হাত তুলে বলি, আজই খোঁজ নিতে যাব স্যার। তাই।'

বউদি বললেন, 'বেশ করেছ, এমন দিনে এলে যে ও বাড়ি নেই। বন্ধু ফিরুক, আবার আসবে।'

'আসব।' বলেই মনু পা ছুঁয়ে প্রণাম করল বউদিকে। এরপর পাপু। বউদি বললেন, 'আবার এসো কিন্তু।'

ওরা ঘাড় হেলিয়ে বেরিয়ে গেল।

বউদি গেট পর্যন্ত এসেছেন। দেখেন, দুটো বালক পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে কত আপনজনের মতো। ইস, কোথায় থাকে জানা হল না। কিছু খেতে বলবেন, তাও মনে আসেনি। কী ভাবল, হাজার হোক ছেলেমানুষ! দেখলেন বস্তি শেষের ওই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। তারপরই বড় রাস্তা। রাস্তার দক্ষিণে বাগান। কোথায় যাবে, কে জানে?

বিমর্ষমুখে ফিরে আসতেই বাড়িঅলি জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁ গো, রতনের বন্ধুরা বুঝি?'

'হ্যাঁ, মাসিমা।'

'কত ভাল ছেলে ওরা।'

বাড়িঅলি বললেন, 'তাই তো দেখলাম।'

'তা তোমরা বুঝি খুব মেরেছিলে ছেলেটাকে?'

'না, না।' বউদি বোঝাতে চাইছিলেন ব্যাপারটা তেমন নয়, তার আগেই পাশের ঘরের পরানের মা বলে দিলেন, 'মা নেই যার, জগৎ অন্ধকার!'

কথাটায় খুব ধাক্কা লাগল। বউদি আর কিছু শুনতে চান না। বলতেও না। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে চৌকির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন।



লঙ্কার দোকান দেওয়ায় বাবা সকালে বাড়ির খাবার খান না। কিনে নেন পাউরুটি আর ঘুঘুনি। ঘুঘনিঅলাও বাবার কাছ থেকে লঙ্কা নেয়। শুধু বেলার দিকে লালু বা ভুলু ওদের দাদুর জন্য কেটলিতে চা দিয়ে আসে। সব দোকান উঠে গেলেও রতনের বাবা বসে থাকেন। বাড়ি যাবার সময় যদি কারও লঙ্কার কথা মনে পড়ে!

লালু বলতে এসেছিল, দাদু, বাড়ি যাবে না? এসে দেখে দাদু নেই। আশপাশে কোনও দোকান ছিল না যে জিজ্ঞেস করে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল দূরের বটগাছের ছায়ায় কাঁকড়া বিক্রী হচ্ছে। কাঁকড়া বিক্রী করছে যে মাসি—তাকে ওরা বলে কাঁকড়ামাসি। গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মাসি, উই যে লাইব্রেরির সামনে বসে লঙ্কা বিক্রি করে আমার দাদু তোমাকে কিছু বলে গেছে?'

'না তো!—বাড়ি যায়নি বুঝি?'

'না।'

'তালে বোধহয় বড় বাজারে গেছে। লঙ্কা কিনে একবারে বাড়ি ফিরবে।'

মনের মতো উত্তর নয়। তবু কী-ই বা বলতে পারে। ও দাঁড়িয়ে থাকে। রোদের গনগনে তেজ। দুই নম্বর পুলের উপর থেকে মাছের জলের ধারা অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে। আঁশটে জলের তীব্র গন্ধ। আর একটু উঠে দেখল ওপারেও কেউ নেই। মাছঅলাদের দোকানের পাশ দিয়ে একটা ঘেয়ো কুকুর শুঁকে বেড়াচ্ছে। দু একটা কাক কুকুরটার এক্কেবারে কাছে কাছে ঘোরাফেরা করছে। অবস্থা এমন, কাক ভাবছে কুকুরের তাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই নেই। আবার কুকুর জানে, তাড়া দেবার আগেই হুস করে উড়ে যাবে। তাই কী দরকার, যে যা পায় খাক না।

লালু দেখল, এই পুল থেকে খেলার মাঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দুই পাশের ফুটপাথ একদম পরিষ্কার। ও নেমে এল। বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবল, মাকে কী বলা যাবে? কাকা চলে গেছে। বাবাও ফেরেনি। দাদুও কি নিরুদ্দেশ হল?—না, ও বরং কাঁকড়া-মাসির কথাই বলবে। বলবে, দাদু বড় বাজারে গেছে। কিন্তু তার পরেও যদি না ফেরে? মন খারাপ। আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে চলে। আজ নিয়ে তিনদিন। আর চার দিন গেলে এক সপ্তাহ। চার সপ্তাহে মাস। বারো মাসে এক বছর। গ্রাম ছেড়ে এসেছে দু' বছর হতে চলল। কাকা কি গ্রামে চলে গেছে?



বড়দা আজ কাজে গেছে। মালিক বলেছেন, অহেতুক দৌড়ঝাঁপ যেন কেউ না করে। তা ছাড়া করলেও তো কোনও লাভ নেই। কলকাতা শহর তো জনসমুদ্র। এর মধ্যে কি রতনকে খুঁজে বের করা যাবে? মেজবাবু থানার ওসি তপনবাবুকে জানিয়ে দেবেন। হেড কোয়ার্টারে মিসিং স্কোয়াডেও নাকি ছবি দিয়ে নাম নথিভুক্ত হয়ে যাবে। বড়দাকে বলেছেন, শান্ত হয়ে বড়িতে বসে থাকুক। নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা ওরাই দেখবে। বড়বাবু বলেছেন, দরকার পড়লে ওদের গ্রামের থানাতেও খবর যাবে।

দাদুকে বাজারে খুঁজে না পেয়ে বাড়ি ফিরে লালু কাউকে কিছুই বলল

না। মুখটা ছোট করে ঘরে ঢুকে গেল। মা বললেন, 'ভুলু তো স্কুলে গেল।'

অর্থাৎ বলতে চাইলেন, তুই কেন গেলি না। কিংবা না গিয়ে ভালই করেছিস। তুই না থাকলে ঘরটা খালি লাগত। যেন কথা কিছু বলতে হয়, তাই বলা। কদিন কে কোথায় যাচ্ছে কী করছে, তার কোনওই নিয়ম নেই। এই বেনিয়মটাই এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। পরিবারে এমন দুর্যোগ খুব কি একটা এসেছে? একটা মানুষ থেকেও নেই, তার যন্ত্রণা কাউকে, বোঝানো যায় না।

রাত অনেক। এক এক করে সবাই এসে পড়ছে। লালু-ভুলুর দাদুর শুধু দেখা নেই। সেই সকালে চট মুড়িয়ে লঙ্কা নিয়ে গেল। এখনও ফেরেনি। সবাই অবশ্য বলছে বাজারে খুব ভিড় বোধহয়। বুড়ো মানুষ বিশ্রাম-টিশ্রাম করে ঠিক চলে আসবে। লালু-ভুলুর রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। ছোড়দা বড়দা বউদি বাকি, অর্থাৎ ওদের বাবা এলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া। ছোড়দা বলল, 'খুব ঘুম পাচ্ছে, খাবার দেবে তো দাও, নয়তো শুয়ে পড়ি। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর আর ভাল্লাগে না।'

এই রুক্ষ কথায় বড়দা ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে কিছু বললেন না।

'কেন আসতে গেছিলে গ্রাম ছেড়ে? এখানে কী সুখটা পাচ্ছ? শুনি? তা ছাড়া রতন রাগ করে চলে গেছে কোথায়। খুঁজে পাবে ভেবেছো? ও নিজে না এলে কেনওদিনই পাবে না। যতই তোমার মালিক কথা দিক।'

কথাগুলো ভীষণই ভয়ঙ্কর। কিন্তু এর কেউ প্রতিবাদও করল না। বড়দা চোখ নামিয়ে নিলেন। ঠক ঠক ঠক...। 'এই চুপ করো। গেটে শব্দ হচ্ছে না?'

ভুলু হঠাৎ বলে উঠল, 'দাদু এসেছে।'

পাঁচ

বন্দুকধারী পুলিশ এখানে এসেই ভীষণ সতর্ক। খাতাওয়ালা পুলিশ জেলের অফিসে গিয়ে কী সব কথাবার্তা বলে আসার পর আরও চার পাঁচজন পুলিশ এল। তারপর একে একে দড়ি খুলে বড় জেলের পাশে ছোট একটা

কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিতে লাগল। প্রথমে রতন, তারপর ওর থেকে একটু বড় ছেলে। এরপর সবাই। পাকা ঘরের সামনে বড় বড় রড। রডের ওপাশে জালঘেরা। ছোট ছোট চৌকো জালের ভেতর থেকে মানুষের চেহারাটাও চৌকো চৌকো লাগছে। রবিবার বলেই বোধহয় জেল চত্বরে বিশেষ ভিড় নেই। রতনের কেমন যেন ভয় করতে লাগল।

রতন এক কোণে বসে সবে মাথাটা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিয়েছে, অমনি দেখলেই ভয় করে ষণ্ডা মতন একটা লোক এসে হাজির হল কোত্থেকে। অনেকটা বইয়ে পড়া ডাকাতের মতোই দেখতে। ঠোঁট দুটো পুরু আর কালো। চোখ রক্তবর্ণ। রতনকে কোনও কিছু না বলেই সে তার সারা গা হাতড়াতে লাগল। জামা প্যান্টের যতগুলো পকেট ছিল, সব। সেই দু' টাকা তিরিশ পয়সা। বলল, 'অন্য কোথাও কি লুকিয়ে রেখেছিস?'

রতন কাঁপছে রীতিমতো। মাথা ঢুলিয়ে বলল, 'না।'

'ঠিক বলছিস তো?'

'হ্যাঁ।'

কী আশ্চর্য, আর কাউকে সে কিছু বলল না। কারও গায়েও হাত দিল না। যেন এটুকু পেয়েই শান্তি। বুঝি এই পয়সাকটির জন্যই ভেতরে তার ছটফটানি ছিল। পেয়ে গেল, এখন নিশ্চিত। এই পয়সা নিয়ে কী করবে? ভাত কিনে খাবে? বিড়ি কিনে খাবে?

রতন ধীরে ধীরে টের পায় ঘরটার মধ্যে গুমোট। যেন ঘরভর্তি মানুষদের নিঃশ্বাস ঘুরপাক খায়। রতন চোখ ঘুরিয়ে দেখে। মাঝ বয়সী একজন পাশে বসে ঝিমুচ্ছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন সব। রতন সত্যি কথাই বলল। ভদ্রলোক বললেন, কাল কোর্টে চালান দেবে পুলিশ। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সব দোষ স্বীকার করবে। তা হলেই শাস্তি কম।

রতন ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়। ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না। চোখের পাতা বন্ধ করে নিলেন।

লোকটা এমন কথা কেন জিজ্ঞেস করল? তাকে দেখে নিজের ছেলের কথা মনে পড়ল কি? নাকি রেলে চড়ে ধরা পড়ায় এমন শাস্তি এঁরও হয়েছিল? কিংবা হাজতবাসের পর ম্যাজিস্ট্রেটেব সামনে বহুবার হাজির হয়েছেন ইনি? যাই হোক, কথা শুনে রতনের একটুকু অবিশ্বাস হয়নি।

আর মিথ্যে কথা বলে লাভই বা কী?

বাইরে দু' একজনের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। একটু বাদেই সন্ধ্যে নামবে। বাইরে কোথাও লরির হর্ণ বেজে উঠছে। এদিকটা ভীষণই নিরালা। একটা ছেলে গরাদের নীচে জাল বাঁকানো ফাঁকা জায়গা দিয়ে কাগজের মোড়ক করে কী একটা ঠেলে দিতেই ভিড়টা হঠাৎই ঝুঁকে গেল ওদিকে। কী দিয়ে গেল?

রতনের হঠাৎ রেল স্টেশন থেকে জেলখানায় আসার পথে সেই ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির কথা মনে পড়ল। মেয়েটা কি এখনও দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে? নাকি পড়তে বসেছে। সেও টুইশনি বাড়ি থাকলে এতক্ষণ বুবাইদের বাড়ি গিয়ে পড়াত। ওর মা কত নালিশই না জানাত তাকে। গম্ভীর হয়ে হয়তো বুবাইকে বলত, 'কীরে, সারাদিন কি দুষ্টুমিই করে যাবি?'

এই তের-চৌদ্দ বয়সে ছেলে পড়ানো, মাস্টারমশাই হয়ে যাওয়া—! রতনের মাঝে মাঝেই হাসি পায়। মনে পড়ে না তার মতো ছোট কেউ টুইশনি করে। ওর নিজের স্কুলের মাইনে বছরে তিনশো। খাতা বই। তা ছাড়া সামান্য কিছু হাতখরচা। এসবের জন্য দাদাদের কাছে কিছু না চাওয়াই ভাল। গরিব ছাত্রদের জন্য কনসেশনের দরখাস্ত করেছিল সে। হয়নি। কেন যে হল না! সারা পরিবারের রোজগার দিতে হয় তাকে। পরিবারের সব সদস্যের হিসেব। তাদের যে রোজগার, মনে হয় যারা ফুল ফ্রি, হাফ ফ্রি, ওয়ান থার্ড...কনসেশন পেয়েছে তাদের থেকেও কম আয় তাদের। তবু তার হয়নি। দু'জন নামকরা লোক সইও দিয়েছিল। যেদিন বাহাদুর স্কুলের নোটিশ দেওয়া খাতায় টাইপ করা ফ্রি পড়ানোর রেজাল্ট নিয়ে এল, রতন আশা করেছিল নাম থাকবে। স্যার প্রথমে ফুল ফ্রির নামগুলো পড়লেন। নেই। হাফ ফ্রি। তাতেও নেই। তারপর আর শুনতে ইচ্ছে করছিল না। খুব দুঃখ হচ্ছিল, তার বন্ধু অসীমের নাম কী করে ফুল ফ্রির তালিকায় থাকে! ওদের দোতলা বাড়ি। দুই দাদার ভাল চাকরি। সেইদিনই মনে মনে ঠিক করে ফেলল, দরকার নেই স্কুলের দয়া নিয়ে। রতন ছেলে পড়ানো ধরল। ক্লাশ টু থ্রি-র ছেলেমেয়ে পড়ানো। আট টাকা দশ টাকা মাইনে। সে জানে এতে পড়াশুনোর ক্ষতি। তবু

পয়সা রোজগার করার মধ্যে আনন্দ আছে।

মাস মাইনের টাকা নিয়ে প্রথম যেদিন বাবার হাতে তুলে দিয়েছিল, বাবা কিছু না বলে তার দিকে তাকিয়েছিলেন। শেষে বললেন, 'এটাই তো চাই, বাবা। কষ্ট করে লেখাপড়া করো, দেখো, এর মর্যাদা একদিন পাবেই।'

ওর থেকে একটু বড়, সেই ছেলেটা কাছে এল। ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের কী করবে এরপর?'

'কী জানি? শুনেছি, কাল কোর্টে চালান করবে। তারপর—।'

'তারপর কী হবে?'

'জানি না।'

'ফাঁসি হবে না তো?'

কথাটা শুনে রতন দমে গেল। পাশের লোকটার দিকে তাকাল। ভদ্রলোক এখনও চোখ বুজে কী যেন ভাবছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে রতন। ঘুমিয়ে যায়নি তো? ডেকে কি জিজ্ঞেস করবে, ও কাকু, শুনছেন—। ঠিক এমন সময় বাইরে একজনকে দেখে কয়েদখানার অনেকে চেঁচামিচি শুরু করল। 'দাদা, আমাকে একটু ছাড়িয়ে নিন না। আপনি যা চাইবেন, তাই দেব।'

'অত কিছু চাই না। টাকা-পয়সা আছে? যদি থাকে বলো, জামিন হয়ে যাবে।' কয়েক ঘণ্টায় অনেক কিছুই জেনে গেছে রতন, জেনে গেছে জামিন মানে মুক্তি। এরপর একদিন ডেট পড়বে। দোষ স্বীকার। জরিমানা। তারপর ডিশমিশ। মুক্তি মানে ঘরে ফেরা। বাবা দাদা বউদি। ভেতরটা ছটফট করতে থাকে। এমন একটা অঘটন ঘটে যাবে, বুঝতে পারেনি। আসলে সারা রাত রেল স্টেশনে থেকে মনে খুব দুঃখ নিয়েই গাড়িতে বসেছিল। টিকিট কাটার কথা একদম মনে হয়নি। পালাতে হবে। পালানোর সময় কোনও অপরাধবোধ থাকে না। ভালমন্দ মাথায় আসে না।

সেই ছেলেটা প্যান্টের ভেতরের পকেট থেকে হঠাৎ চকচকে একটা হাতঘড়ি বের করল। বের করেই লুকিয়ে ফেলল। রতন ওর হাত চেপে ধরে। ছেলেটা অবাক হলেও চুপ। আশপাশে তাকায়। রতন বলল, 'ঘড়িটা জমা রেখে জামিন হয়ে যা।'

'আমিও তাই ভাবছি। সারা রাত এখানে থাকা যাবে না।'



রতন ওর হাত চেপে ধরে।

রতন সহসাই অন্য কিশোর যেন। চাতুরির আশ্রয় নিয়ে বলল, 'রাগ করে এসে ধরা পড়েছি। আমার বাবা গরমেণ্ট সার্ভিস করে। কলকাতায় আমাদের নিজের বাড়ি—।' এটুকু বলেই থেমে গেল সে।

ছেলেটি বলল, 'একটা ঘড়িতে দু'জনের জামিন হবে?'

'হবে না কেন? সোনার জল দেওয়া ঘড়ি। তাও নতুন। যা, দেখা।'

গরাদের নীচ দিয়ে ঘড়িটা পেয়েই লোকটা বলল, 'একজন তো?'

'না, দুজন। আমরা দুই বন্ধু।' রতন বলে উঠল।

'ঘড়ি তো জামিন দেবে না, দেবে টাকায়। কাল দুপুরের মধ্যে একশো টাকা এনে দিতে পারবে?'

এবারও রতন। 'পারব।'

'নাম বলো।'

রতনের ইচ্ছে হল, বাবার নামটা অন্তত মিথ্যে বলে। কিন্তু মনটা কিছুতেই সায় দিল না। মা নেই। বাবার নাম মিথ্যে মানে—। সে সত্যিই বলল। শুধু ঠিকানায় নম্বরটা বদল করে দিল।

খানিকবাদে পুলিশ এসে গেট খুলে দিল।

রতন প্রাণপণে নিজের মনে উচ্চারণ করল, 'আঃ!'

□

আলো থাকলেও জেলের বাইরে এসে ঠিক করতে পারে না স্টেশন যাবার রাস্তা। একজনকে জিজ্ঞেস করল। রতনের ব্যস্ততা যেন একটু বেশিই। ছেলেটি বলল, 'অত তাড়াহুড়ো করছিস কেন?'

লজ্জা পেয়ে বলল, 'কই, না তো!'

'তোর নামটা যেন কী বললি?'

'রতন।'

'আমার নাম মনে আছে তো?'

রতন ঘাড় কাত করে দেয়।

তিলক সর্দার। বাড়ি হাসখালি। বলছিল, 'আমার মা ছাড়া কেউ নেই। কলকাতা শহরে পুরনো শিশি-বোতলের দোকানে কাজ করি। ঘড়িটা খুব কষ্ট করে কিনেছিলাম।'

'তুই চিন্তা করিস না। আমার সঙ্গে চল। একশো টাকাই দেব।'

'সেই জন্যেই তো তোকে—।'

কথা থামিয়ে রতন বলে, 'উঃ, তুই যে কি না। বলেছি তো দিয়ে দেব। যাওয়ার ভাড়া হবে তো?'

তিলক বলল, 'যা আছে তাতে দু'জনের ট্রেনের ভাড়া হবে না।'

'হাফ টিকিটের পয়সাও না?'

'না। তাছাড়া এখন তো আমাদের হাফ কাটলে চলবে না।'

'চলবে না কেন? চালালেই হয়। চেকার ধরলে বলব, পয়সা ছিল না অত। তাই—।'

এই দুঃসময়েও হাসে তিলক। বলে, 'তোর দেখছি সোজা যুক্তি। এতই যদি বুদ্ধি তো ধরা পড়লি কেন?'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'তখন কি আর মনটা ভাল ছিল? বাড়িতে রাগারাগি করে এসেছি না! ওই সময় যদি কেউ এসে বলত, আমাকে দূর দেশে পাঠিয়ে দেবে। তাতেও রাজি হয়ে যেতাম।'

'বলিস কী?'

'হ্যাঁ।—আসলে কি জানিস, ছোটবেলা থেকেই দুঃখ কষ্ট—।'

'তবে যে বললি তোদের নিজেদের বাড়ি, দাদারা চাকরি করে। বাবা—।'

ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। বলল, 'আরে বোকা, থাকলেই কি ভালবাসা মায়া মমতা সবার থাকে? আমার মা নেই যে! মা না থাকলে দাদা বল বাবা বল, কেউ ভালবাসে না।'

মায়ের কথায় তিলকের মনটা নরম হল। হয়তো সত্যি। সপ্তাহে একটা দিন বাড়ি আসে সে। মা তখন যে কী করে। সারাক্ষণ যেন ছুঁয়ে থাকে তিলককে। বলল, 'ঠিকই বলেছিস। পৃথিবীতে মায়ের কোনও তুলনা নেই।' কথা শেষ হতে না হতেই রতন হঠাৎ হোঁচট খেল। মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল। দৌড়ে গিয়ে ধরে তিলক। 'এত অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলিস?'

রতন বসে বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরে। ব্যথার বেগ সারা শরীর ছড়িয়ে যায় যেন। এ সময় অন্য দিকে তাকানোর কথা নয়, তবু তাকায়। সেই দোতলা বাড়ি। সবুজ রঙের, ঝোলানো বারান্দা। না, কেউ দাঁড়িয়ে

নেই ওখানে। সেই মেয়েটা নিশ্চয় পড়াশুনো করছে ভেতর ঘরে। যাক, দেখেনি তাহলে। তিলক বলে, 'ওদিকে কী দেখছিস রে?'

'কিছু না।' বলেই উঠে পড়ে। যেন সামান্য চোট লেগেছে।

'কিছু না, কী রে, এ যে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে।'

'ছেড়ে দে, চল। কল থেকে ধুয়ে ফেলি। রক্ত নিমেষে উধাও হবে।'

'এই রতন!'

'ধুস, ভয় করছে? এমন তো কত হয়। খানিকক্ষণ বেরিয়ে আর বোরোয় না। কাটা জায়গার মুখে রক্ত জমাট বেধে যায়। তা ছাড়া এই রোগা শরীরে অত রক্ত কোথায়?'

রানাঘাট স্টেশনের টিকিট কাউণ্টারের সামনে এসে ওরা একসঙ্গেই ঘোরাঘুরি করতে লাগল। নীচে টিকিট পড়ে থাকতে দেখে তিলক দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল। কখনও সোজা করে কখনও কাত করে দেখতে থাকে টিকিটটা কোথাকার। ক্ষুদে ক্ষুদে ছাপা অক্ষর অল্প আলোয় ঠিকমত বোঝা যায় না। বিমর্ষ তিলক রতনকে ডাকতে যাবে, আর তখনই দেখে ও নেই। ছুটে এসে এদিক ওদিক তাকায়। তিলকের কেমন অস্থির অবস্থা। কাল দুপুরেই টাকা দিতে হবে হরিশ মুহুরিকে। নয়তো ঘড়ি ফেরত পাবে না। জামিন হবে না। জামিন না পেলে পুলিশ হয়তো আবার গিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে—'রতন!'

খিলখিল করে হেসে দেয় রতন। তিনজন লোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল, তাদের পেছনে গিয়ে ওকে ঘাবড়ে দেওয়া। আসলে, এমন একটা ফাঁকই খোঁজে সে। কোন মুখে বাড়ি যাবে। জেদ দেখিয়ে চলে এসেছে। তা ছাড়া ওকে নিয়ে গেলে তাদের ভাড়ার ঘর, বস্তি বাড়ি আর সব থেকে বড়, বাবাকে দেখলেই বুঝে যাবে সে মিথ্যে বলেছে। মিথ্যে বলে সে জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে এনেছে নিজেকে। রতন অবশ্য এও জানে, এমন করা মানে পাপ করা। বন্ধু ঠকানোর ফল হিসেবে মৃত্যুর পর যমরাজের কাছে শাস্তি পেতে হবে। তবু নিরুপায় রতন। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, 'অপরাধের জন্য আগেই ক্ষমা চাইছি, তিলক।'

পালাবার জন্যই আগাম মহড়া রতনের। ওর এই হাসিতে তিলক কি ধরতে পারল? বলল, 'না, তুই আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাক। হাত ধরে।'

‘গেটে কোনও চেকার নেই। চল, আমরা দু’ নম্বর প্ল্যাটফর্মেই যাই। শিয়ালদার গাড়ি এলে উঠে পড়ব।’

‘ফের বিনা টিকিটে?’

‘কিছু তো করার নেই আমাদের। ধরলে সত্যি কথাই বলব। বলব, আমরা বাড়িতে টাকা আনতে যাচ্ছি। বিশ্বাস না হয় পুলিশকে জিজ্ঞেস করুন। দেখিস, বড়জোর বলবে এমনভাবে আর যাতায়াত করবে না।’

অবস্থা বিশেষে সব মানুষেরই বুদ্ধি, কথাবার্তা ঠিকঠাক বেরিয়ে আসে। একা একা ভাবলে মনে হয়, আরে, এমন সুন্দর কথাগুলো কী করে এল?

এবার ওদের সত্যিকারের ভয় ঢুকে গেছে মনে। তিলক জানে, দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে যে গাড়ি সেটা কলকাতায় যাবে। রবিবারের রাতের গাড়িতে ভিড় একদম নেই বললেই চলে। ওরা অন্ধকার একটা কামরাই খুঁজছিল। তবে যেটায় উঠেছে তা একেবারে আলোহীন নয়, একটা বাল্ব জ্বলছে। জানালার ধারে বসেছে। ট্রেনপথে ভয় বেশি বড় স্টেশনগুলিতে। সেসব জায়গায় নাকি চেকার থাকে। তিলক জানে সব। রতনের জানার কথা নয়। গ্রাম ছেড়ে কলকাতা এসেছিল! তারপর এই তার রেলে চড়া। রতন বলল, ‘বিনা টিকিটে সিটে বসা ঠিক নয়। আমরা গেটের কাছেই থাকি। রড ধরে দাঁড়াব। তেমন বুঝলেই লাফ।’

তিলকের সাড়া না দিয়ে উপায় নেই বোধহয়। তার আর কিছুই করার নেই। ওর জন্যেই যাওয়া। কলকাতামুখি যাওয়া মানে ওর কথা শোনা। রতন জানতে চায়, ‘সামনের স্টেশনের নাম কী রে?’

‘শিমুরালি।’

এই নামটা কোথায় যেন শুনেছে! কোথায়, কোথায়? ও তাড়াতাড়ি মনে করার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। মাসির ছেলেরা থাকে। সুরজিৎ, অভিজিৎ। বাড়িটা কোথায় জানে না। দেখেওনি কোনওদিন। তবু কি নাম বললে লোকে চিনবে না? ভাবতে ভাবতেই গাড়িটা আস্তে হয়ে যাচ্ছে। ওই তো, হলুদ রঙের সিমেন্টের বোর্ডে লেখা প্রথমে বাংলায় মাঝে ইংরেজি, নীচে হিন্দিতে। শিমুরালি। রতন রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকে। কী করা যায়, কী ভাবে নামবে? নেমেই লাইন বরাবর সোজা দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে...। না, রতন নামতে পারে না। গাড়িতে হুইসেল

পড়ল। গাড়ি ছাড়বে। গাড়ি চলতে শুরু করবে। হুউপ...কাটকাট...তারপর ঝড়ের বেগে। গা হাত পা কাঁপছে ওর। তিলক বলল, 'কী রে, অত ঝুঁকে আছিস কেন, পড়ে—।' কথা শেষ হওয়ার আগেই চলন্ত ট্রেন থেকে রতন লাফ দেয়।

টাল খেতে খেতে সামলে নিল। প্ল্যাটফর্মের লোকজন হা হা করে উঠল। 'এই দেখ দেখ, একটা ছেলে পড়ে গেছে।—হেই...।'

কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়েই রতন দেখল, তিলক রড ধরে ঝুঁকে আছে। গাড়ির এখন বেজায় গতি। কাঁদছে না তিলক?

ছয়

সুরজিৎদের বাড়ি খুঁজে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। একজন বলল, আরে ওই যে, ছয় আঙুলে। বাড়িতে পানের বরোজ। বিনোদ মাস্টারের সামনের বাড়ি।

ছয় আঙুল বলায় রতনের মন খুশি। সত্যিই যদি হয় তবে মাসির ছেলেই হবে। কেননা মায়েরা চার বোন। প্রত্যেক মাসির কড়ে আঙুলে একটা করে আঙুল জোড়া। সেজদার কড়ে আঙুলের পাশে ছোট গোল শামুকের মতো একটা আঙুল। সেই আঙুলেরও নখ কাটে সেজদা। সেটা কোনও কাজেই লাগে না, কিন্তু পরিচর্যা অন্যদের মতোই। বড়দা, মেজদার আঙুল জোড়া। শুধু তারই হয়নি। আঙুলের কথা শুনে রতন বলল, 'ঠিক বলেছেন।'

যেতে যেতে অদ্ভুত একটা চিন্তা মাথায় এল। ভাবছে, ওই বাড়িতে গিয়ে হয়তো সবে বলেছে, 'আমার মায়ের নাম চারু,' আর অমনি হয়তো কেউ বলে উঠবে, আঙুল দেখি? গল্পের সেই রাজপুত্রকে যেমন প্রমাণ দিতে হয়েছিল রাক্ষসদের কাছে। সেই লোহার মটর চিবানোর মতো করেই আঙুল মেলে দেখাতে হবে রতনকে।

সে যখন তার আঙুলগুলো মেলে ধরবে তখন যদি বলে, না। তুমি চারু মাসির ছেলে নও।—আর কী প্রমাণ আছে? তোমার ছয় আঙুল কোথায়?

প্রমাণ হিসেবে বলতে পারবে, আমাকে দেখুন মায়ের মতো চেহারা। রোগা, কালো।

উহুঁ!

তখন কি ফিরে আসবে? বলবে কি খুব বিপদে পড়ে এসেছি। শুনুন। আমার মামাদের নাম—।

রতন নিজের মনেই হাসল। এসব ভাবতেই ভাবতেই পৌঁছে গেল বাড়িটায়। এই তো লাল রঙের শিবমন্দির। পানের বরোজ। গোলাপ গাছ।

ওরা খুব আদর করল। জিজ্ঞেস করল গ্রাম ছেড়ে কতদিন হল শহরে এসেছে। কোথায় আছে। কে কী করছে। বড়দা সুরজিৎ বলল, 'সত্যি, ছোট মাসির মতো মানুষ হয় না। ছেলেবেলায় মাসির কোল থেকে নাকি নামতাম না।'—এমন নানান কথা। মাসির মেয়ে বলল, 'তোর মুখখানা অমন শুকনো শুকনো কেন? ভাত খাবি?'

রতন মৃদু আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু আপত্তি টেকেনি। হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে দুপুরের রান্না ট্যাংরা মাছের ঝোল। উঃ, ভাত পেটে পড়ে কী যে স্বস্তি। বাবার কথা দাদাদের কথা বারবার আসছিল। নিজের অভিমানের কথা চেপেই বলতে হচ্ছিল তাদের কুশলবার্তা। এখানে এসে বুঝতে পারে, কত সুন্দর সম্পর্ক। কিন্তু রতনরা জানে, এদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। বাবা মায়ের সঙ্গে কোনও দিন হয়তো ঝগড়া হয়েছিল, সেই দায় বইতে হচ্ছে সবাইকে। যদি কোনও দিন ঘরে ফেরে তখন বলবে এদের কথা। মাসির মেয়ের নিজের সামনে বসিয়ে খাওয়ানোর কথা। আর এও বলবে, আমাদের সকলের কথা কত অন্তর দিয়ে জানতে চাইছিল।

'একটু ঘুরে আসি?' রতন বলল।

'যাবি। অত ব্যস্ত হয়েছিস কেন?' মাসির মেয়ে বলল।

সত্যিই তো, বেশিক্ষণ তো সে আসেনি। রতন জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের এখানে টুইশনিতে কেমন দেয় গো?'

চোখ বড় করে মাসির মেয়ে বলে, 'কেন, তুই পড়াস নাকি?'

মাথা নামিয়ে মিটিমিটি হাসে রতন।

'এই ভাই, তুই ছাত্র পড়াস?—কোন ক্লাশে পড়িস তুই?'

'এইট।'

'আর ছাত্ররা?'

'বেশি উঁচু না। টু থ্রি, ফোরেরও ছাত্র আছে।'

'কত পাস?'

'সব মিলিয়ে গোটা চল্লিশ হয়।'

'সে কী রে?—এই বয়সে তুই মাস্টারি করিস?'

'হ্যাঁ দিদি, খুব কষ্ট করে আছি।' বলেই একটু আনমনা হয়ে যায়।

'তুমি তো জানো আমাদের গ্রামের বাড়ির অবস্থা। এখানে এসেও বাবা ফুটপাথে লঙ্কার ভাগা দিয়ে বসে। বড়দা একটা বাড়ির পাহারাদারের কাজ করে। আর—।' বলেই থামল রতন।

মাসির মেয়ে বলল, 'আর কী, বল না। লজ্জা কীসের, আমি তো তোর দিদি।'

'যে ঘরে থাকি, সেটাকে ঘর বলে না। পায়রার খোপের মতো। পিছনের জানালা খোলা যায় না। দিনের বেলাতেই আলো জ্বালতে হয়। সাতজন এক ঘরে। গরমের সময় সব আমরা উঠোনে শুই।'

'কী বলিস রে, ভাই!' দিদি যেন চমকে চমকে ওঠে।

'হ্যাঁ। আর শুনতে চেয়ো না। সকাল সন্ধেয় আঁচের দমবন্ধ অবস্থা। চারদিক ঘেরা যে, হাওয়া বাতাসের বালাই নেই।'

'ইস!'

'আর শুনবে।'

'না, শুনতে চাই না।'

ইচ্ছে হয়, এই ফাঁকে দিদিকে সব ঘটনা বলে দেয়। দিদির মনটা এই এখন খুব নরম হয়ে পড়েছে। ওর কেন এখানে আসা, কেন সে পালিয়ে এল—সব। সব শুনে কি দিদি বাড়ি থেকে বের করে দেবে তাকে?

'আয়, বারান্দায় বসি।—কী সব বলছিস রে তুই।'

সে যে মিথ্যে বলছে না, দিদি বিশ্বাস করে। বরং এসব কথা শুনিয়ে মনটা তার বেদনায় ভরিয়ে দেওয়া।

মাদুর পেতে দুজনেই বসল। দিদি বলল, 'তুই যখন এলি, তোর



মাদুর পেতে দুজনেই বসল।

চেহারা দেখে কেমনই মনে হচ্ছিল। এর চেয়ে ভাল জামা নেই তোর? চটি পরে আসিসনি কেন?'

'চটিটা স্টেশনে—।' চুপ করে যায় রতন।

'স্টেশনে বল কী হয়েছে, স্টেশনে কী?'

'কিচ্ছু না।'

'কি কিচ্ছু না, তুই লুকোচ্ছিস কিন্তু।—এই রতন, বল। কী হয়েছে?'

'দেওয়ালে ওই ছবিটা কার গো, মাসি-মেসোর?'

'হ্যাঁ। বল—সোনা ভাই।' বলেই ওর পিঠে হাত রাখেন দিদি।

'সে অনেক কথা। বললে তুমি রাগ করবে।'

'কথা দিচ্ছি, রাগ করব না। কী হয়েছে?'

'পরে বলব।'

'না। এখনই বল।'

'বলেছি তো, শুনলে রাগ করবে। কষ্ট পাবে। তারপর আমাকে আর ভালবাসতে পারবে না।'

দিদি ভাল করে দেখেন রতনকে। দেখে নিতে চান, বুঝে নিতে চান যেন ওকে। ভয়ঙ্কর কোনও অপরাধ করেই কি আশ্রয় নিল রতন?

□

রাস্তাটা সোজা পুব দিক থেকে এসে রেল লাইনের পাশ বরাবর স্টেশনে মিশেছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেখল সবুজ সিগন্যাল। মানে এক্ষুণি গাড়ি ঢুকবে। এখন এখানে থাকা ঠিক নয়। কোথা থেকে কী হয়ে যাবে শেষমেষ। রতন পায়ে পায়ে প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া একটা চায়ের দোকানের পাশে এসে দাঁড়াল। রেডিয়োতে বলল 'সমীক্ষা : চারুকলা প্রসঙ্গে —লিখেছেন প্রণবেশ সেন।' চারুকলা মানে কী, রতন জানে না। শুনল। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ একটা আলোচনায় কানটা সজাগ হয়ে উঠল তার। শুনতে শুনতে গা হাত পা কাঁপতে লাগল। এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ভান করল যে সে রেডিয়োর চারুকলা প্রসঙ্গই শুনছে। চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দু' তিনজন বলাবলি করছে, আর বদমাইসটা চলন্ত ট্রেন থেকে—। কী সাহস!'

'তোমরা খুঁজে পেলে না?' দোকানদার প্রশ্ন করল।

'মহা চালু। ও কি আর এ তল্লাটে আছে? খুঁজিনি আবার?'

'আশ্চর্য।' দোকানদার আবার বললেন।

'কালও খুঁজব। ক্লাবে জানিয়ে এলাম আমরা। ছেলেটাকে কাল আসতে বলেছি। না ধরতে পারলে ওকে চাঁদা তুলে—। কী কান্না তার!'

'কলকাতার ছেলে। বুঝছিস না?'

উত্তরে আগের ছেলেটা বলল, 'যাবে কোথায়? এখানেই কোনও বাড়িতে আছে। ধরতে পারি একবার। সেয়ানাগিরি ছুটিয়ে দেবো।'

দোকানের আলোয় এক খরিদ্দারের ছায়া পড়তেই রতন ধীরে ধীরে মানুষজনের মধ্যে মিশে গেল। ওর এমন অবস্থা এখন, মাসির বাড়ি পর্যন্তই বুঝি যেতে পারবে না। একবার ভাবল, যাবে। আবার ভাবল যাবে না। কী যে করে, কোনও রকম চিন্তাতেই আসছে না। রতন থেমে গেল। কোনও কিছু কি ফেলে এসেছে দিদির বাড়িতে? না। কিছুই ছিল না হাতে। খালি হাত খালি পা। খালি পকেট। এখানে আর কিছুতেই নয়। এখান থেকেও পালাতে হবে তাকে।

একটু ঘুরে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠল রতন। ট্রেনটা যে কখন আসবে! শিমুরালির দুটো স্টেশন পরে গিয়ে নেমে পড়বে সে। রাতটা স্টেশনে কোনও রকমে কাটিয়ে—। তারপর যা হোক ভাবা যাবে। খারাপ লাগছে দিদির জন্যে। কী ভাবল কে জানে? স্টেশনের কথাটা শেষ না করেই বেরিয়ে এসেছে। কোনও উত্তর না পেয়ে খুব বাজে কথাই ভাবছে হয়তো। ইচ্ছে ছিল বাড়িতে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলবে। কিন্তু সে সুযোগও পেল না। এর মধ্যে একটাই ভাল, তিলককে আসতে বলেছে ক্লাবের ছেলেরা। তাকে না পেলে, ওরা কথা দিয়েছে চাঁদা তুলে ওর একশো টাকা তুলে দেবে—ক্ষমা করিস তিলক।

সাত

বেলা তখন দুটো। প্রথমে মনু ও পাপু। পিছন পিছন পরেশ স্যার। মনু বলল, 'আসুন স্যার, ওই যে সোজা ঘর।'



বলল, 'আসুন স্যার, ওই যে সোজা ঘর।'

উনুনের হাঁড়িতে খিচুড়ি ফুটছে। খিচুড়ির ফেনা হাঁড়ির গায়ে। পাশের ঘরের সুকুমারের মা বললেন, 'ও মায়া, দেখ তোমাদের ঘরে কারা এসেছে।'

বউদি পাতকুয়োয় জল তুলছিলেন। উঁকি দিয়ে বালতিটা না নিয়েই চলে এলেন। ভিজে হাত কাপড়ে মুছতে মুছতে সবে দাঁড়িয়েছেন, পরেশ স্যার বললেন, 'আপনি কে হন রতনের?'

বউদি বুঝলেন, ইনি রতনদের মাস্টারমশাই। বললেন, 'আজ্ঞে, বউদি।'

'বাড়িতে আর কে কে আছে?'

ঘোমটা ঠিক করে বউদি বলেন, 'রতনের দুই দাদা, বাবা আর আমার দুই ছেলে।'

'ঘরে নেই ওরা?'

'ছেলে দুটো কর্পোরেশন স্কুলে পড়ে। ওর এক দাদা লেদ কারখানায়। বাবা সেই সকালে বেরিয়েছেন, এখনও—আর ওর বড়দা থানায়।'

যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, 'থানা কেন, কিছু খবর পেয়েছেন?'

'তা তো জানি না স্যার!'

'আচ্ছা, ও যখন বাড়ি থেকে বেরোয়, পরনে কী ছিল?'

'ওই তো হাফ প্যান্ট আর ফুলহাতা জামা। হাওয়াই চটি।—কেন স্যার?'

পরেশবাবু দুই হাতের আঙুলগুলো জড়াতে লাগলেন।' কোনও খবরই পাননি?'

'না স্যার!'

মুখটা ভীষণই ভার হয়ে গেল যেন পরেশবাবুর। কিছুক্ষণের মধ্যেই বউদি কেঁদে ফেললেন। 'কী হয়েছে, সত্যি কথাটা বলুন। ও বেঁচে আছে তো?'

পরেশবাবু কেমন আনমনা যেন। বললেন, 'থাকবে না কেন?'

'রতন কোথায়, খোঁজ পেয়েছেন?'

'না। পাইনি, তবে—।'

'তবে কী স্যার? আমাকে লুকোবেন না। বলুন।'

এমন সরাসরি কথাবার্তা আজ পর্যন্ত বলেননি। হঠাৎ খিচুড়ি উতলে সারা উনুন ধোঁওয়ায় ধোঁওয়া।

'ভাতটা নামিয়ে নিন।'

'কিছু হবে না। উনুন নিভে গেল।—ভেতরে এসে বসুন। কী হয়েছে রতনের?'

'অন্য সময় আসব। টিফিনের ফাঁকে বেরিয়ে এসেছি।' বলেই গেটের দিকে এগোন। গেলেও দ্বিধা কিন্তু থেকেই যায়।

বাড়ির সবাই বেরিয়ে এসেছে। সবার চোখেই জিজ্ঞাসা। বাড়িঅলি এবার নীচে নেমে এলেন। দ্রুত পায়ে এগিয়ে জানতে চান, 'কিছু হয়েছে, মাস্টারমশাই?'

পরেশবাবু এবার ঘুরে দাঁড়ালেন। বলেন, 'আপনি এদের কিছু হন?'

'না। ওরা আমার ভাড়াটে।'

এতক্ষণ পর যেন আশ্বস্ত হলেন স্যার। বলেন, 'আড়ালে আপনাকে কটা কথা বলতাম।'

যেন হঠাৎ করেই শরীরে ঘাম দেখা দিল তার। বললেন, 'আমার ঘরে আসুন, স্যার।'

পরেশবাবু আর বাড়িঅলি দিদি কেন ঘরে ঢুকে যাচ্ছে? বউদি যাবার কোনও চেষ্টাই করলেন না। ধপ করে বারান্দায় বসে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমি জানি রতন বেঁচে নেই।' বলেই দেওয়ালে মাথা কুটতে লাগলেন। সাহস করে পাপু বলল, 'আপনি কাঁদবেন না। রতন ঠিক ফিরে আসবে।'

'ওরে ভাই, সব মিথ্যে কথা—।'

'না, মিথ্যে নয় বউদি, দেখবেন! আজ একটা খবর বেরিয়েছে 'লরি চাপায় কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যু'। তাই স্যার এসেছেন। পরিচয় জানা যায়নি। লাশটা কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানার পুলিশ নিয়ে গেছে।'

মনু বলল, 'এই খবর নিয়ে টিচার্স রুমে আলোচনা হয়েছে। স্যাররা বলেছেন, না না। রতনের হবেই না। ও কৃষ্ণনগর কী জন্যে যাবে?'

'বলা যায় না সোনা, আজ নিয়ে চার দিন হল। ও কি আর এক জায়গায় থাকবে? ঘুরতে ঘুরতে হয়তো নিয়তিই ওকে টেনে নিয়ে গেছে।' বউদির বিলাপ আরও বাড়ে।

বউদিকে শুইয়ে দেওয়া হল ঘরে নিয়ে। 'সত্যি কী দুর্যোগটাই না

চলছে এদের।' পাশের ঘরের মুণ্ডলির মা কথাগুলো বলে খিচুড়ির হাঁড়িটা নামিয়ে লোহার শিক খুঁচিয়ে গনগনে কয়লাগুলো নামিয়ে দিলেন। যেন নিজের মনে করেই করা এসব। এটুকু না করলে কেনই বা পাশাপশি থাকা? মুণ্ডলির মা বউদির মুখখানায় ভিজে হাত বুলিয়ে বলেন, 'ও দিদি, চোখ খোলো।'

ধীরে ধীরে ভিড় কমে যে যার ঘরে ঢুকে গেল। বাড়িটা আগের চেয়ে অনেক শান্ত এখন। বেলার তেজ তেমন নেই। কাকগুলো একটা একটা উড়ে এসে বসছে টালির চালে। নিজেদের মধ্যে ঠোকরাঠুকরি করে আবার কেউ পালিয়ে যাচ্ছে। কেননা, অনেক ঘরের সামনেই এঁটো বাসনের হাতছানি এখন।

বউদি তাকিয়ে আছেন সদর দরজার দিকে। ছেলে দুটোও যদি আসত! না। ওদের আগে বড়দা ঢুকলেন। হাতে একটা খাম। ঘরে পা দিয়ে যেন এমনিই জিজ্ঞেস করা, 'শরীর খারাপ?'

উত্তরে বউদি জানতে চাইলেন, 'খবর পেলে?'

'কী আর খবর! পুলিশ আমাদের কিছুই করবে না।—ওরা মানুষ?'

'কেন?'

'কোনও কথাই শোনে না। অফিসার বলে, খবর নেই। ব্যস। আর কিছু নয়। দু'জনকে দামি সিগারেটের প্যাকেট দেবার পর একজন বললেন, সুবিমলবাবুর কেস তো? খবর পেলে জানিয়ে দেব।'

'স্কুল থেকে ওদের এক স্যার এসেছিলেন। কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে।'

বড়দা তড়াক করে লাফিয়ে বললেন, 'কী খবর? কোথায়?'

'কৃষ্ণনগরের রাস্তায় একটা লরিতে—।'

'বলো কী?—স্যার কোথায়?

বউদি তেমন শান্ত হয়েই বলেন, 'স্কুলে। টিফিনে এসেছিলেন।'

বড়দা জামাপ্যান্ট খোলেননি। নাইট ডিউটি থেকে ফিরে এখন আর দাঁড়ালেন না। গেট থেকে বেরুতেই লালু-ভুলুর ডাক 'বাবা, কোথায় যাচ্ছ?—বাবা!'

ভুলু দৌড়তে যাবে, লালু বলল, 'দাদা, বাবাকে পিছু ডাকিস না।'



বড়দাকে হেডস্যারের ঘরে নিয়ে বসিয়েছেন অন্য স্যাররা। পরেশবাবু বললেন, 'আপনি বিশ্রাম করুন। হেডস্যার ক্লাশে গেছেন। উনিই সব বলবেন।'

মাথা নিচু করে থাকেন। অন্য সময় হলে কিছুতেই বসতেন না স্যারের সামনের এই চেয়ারে। নাইট ডিউটির 'পোশাক। খাকি জামায় অন্য কাপড়ের পট্টি পেটের কাছে। মালিকের কাছ থেকে পাওয়া পুরনো প্যান্ট। মুখভর্তি দাড়ি। পরেশ স্যার যেন সতর্ক চোখ রেখে আছেন বড়দার উপর। বলেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না। স্যার এখান থেকে ট্রঙ্ক্‌কল করে কৃষ্ণনগর থানায় কথা বলেছেন। ওরা বলেছেন খোঁজখবর নিয়ে জানাবেন।'

'স্যার, ও বেঁচে আছে তো?'

'অত মন খারাপ করছেন কেন? ও আপনার ভাই, আমাদেরও তো ছেলে!'

এই কথায় বড়দার বুক থেকে চাপা পাথরটা যেন সামান্য একটু আলগা হল। হেডস্যারকে দেখেননি বড়দা। কেমন মানুষ, বয়স কত কিছুই জানেন না। স্যারের চেয়ারে একটা তোয়ালে ঝোলানো। পাশে টেলিফোন। এটুকু ছাড়া এই মুহূর্তে হেড স্যারের কোনও অস্তিত্ব নেই। হয়তো এক্ষুণি ঘণ্টা পড়বে। স্যার কি এ পাশ দিয়ে ঢুকবেন? আগে থেকেই উঠে দাঁড়াবেন কি?

ক্লাশ থেকে ফেরার পথেই বোধহয় কেউ জানিয়েছেন, রতনের বড়দা এসেছেন। হাতের ডাস্টার আলমারির পাশে রাখতেই বড়দা হাতজোড় করে বললেন, 'স্যার, আমি—।'

'নমস্কার'—হেডস্যার শান্তিবাবু কী যেন খুঁজতে থাকেন। খোঁজাখুঁজির মধ্যেই বলেন, 'ওকে কি খুব মেরেছিলেন?'

'তেমন কিছু নয়, বাবা একটু—।'

'মারধোর করবেন না। ছেলেমানুষ, এই বয়েসটায় সেণ্টিমেণ্ট ভরা। যদিও বা করেন নিজেদের মধ্যে, বাইরে সবার মধ্যে একদম নয়।'

'ঠিক বলেছেন আপনি। বাবা না—।'

'আর বলতে হবে না। বুঝেছি। আমাদেরও দুশ্চিন্তায় ফেলেছে বাঁদরটা। খবর করছি, দেখা যাক!' বলে এবার সিটে বসলেন হেডস্যার।

'কৃষ্ণনগরে কাল একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। মনে হচ্ছে রতন নয়। খবর করছি। দেখি। নয়তো পরেশবাবুকেই পাঠাব ওখানে।'

'স্যার।' বড়দা আবার হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন।

'ও বুদ্ধিমান ছেলে। রাগ পড়লে ফিরে আসবে।'

ফিরে আসছেন বড়দা। বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। পরেশবাবু দাদার গায়ে হাত রাখেন। বলেন, 'একটু পরেই আমি বেরিয়ে পড়ব। ফিরে আমিই আপনাকে ভাল খবরটা দিয়ে আসব।'

মুখটা উজ্বল হয়ে উঠল যেন। হঠাৎ করেই যেন আনন্দের প্রকাশ ফুটে উঠেছে চোখেমুখে, ঠোঁটের কোনায়। সড়াত করে গেট খুলে দিল বাহাদুর। বলল, 'স্যার ইনি কি রতনের দাদা?'

'হ্যাঁ।'

'যান। ভগবান ঠিক ফিরিয়ে আনবেন ওকে।'

আবার নমস্কার করেন বড়দা।



রতনের বাবা রাত করে ফিরছেন এ কদিন। হাতে কাঁচালঙ্কার পোঁটলা। ফিরে কিছুই জিজ্ঞেস করেন না। যেন রতন ফিরলে তার খবর পাড়ায় ঢোকার মুখেই পেয়ে যাবেন। কেননা এলাকার সবাই প্রায় জেনে গেছে।

কাল ফেরার সময় গলির অন্ধকারে কে যেন বলছিল, 'এই বুড়োর ছেলে?' অন্য এক বউ বলল, 'আহা রে, এই বয়সে ছেলের শোক—।' বাবা ফিরেও তাকাননি। যেন শোনেননি কিছুই। চুপচাপ, টুকটুক করে ফিরে এসেছিলেন। যত দিন যাবে, আরও কত শুনতে হবে। এক এক সময় মনে হয় আর পারবেন না। দোকানে বসে ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে। দুই ভাগা পয়সার বদলে এক ভাগার দাম নিচ্ছেন। কখনও সখনও বেশি নিয়ে মন্দ কথা শুনতে হচ্ছে। অথচ বলতে পারছেন না, 'মন ভাল নেই বাবা। আমার ছেলে হারিয়ে গেছে।'

বাবাকে দেখে বউদির খুব ভয়। একদম চুপ হয়ে গেছে মানুষটা। বড়িতে থাকলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দরজার দিকে। ভাত দিলে শুধুই আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করেন। বউদির এখন বারবারই মনে হয়,

গ্রাম ছেড়ে আসতে চায়নি রতন। এখানে এসে রোজ কাঁদত। বলত, চলো, আমি তুমি আর লালু-ভুলু ফিরে যাই। তোমাদের বাড়ির মাঠে ছোট একটা ঘর কবর। 'এই কথাগুলো বার বার মনে পড়ছে এখন।—আচ্ছা, ও গ্রামে ফিরে যায়নি তো?'

বাবা বলছিলেন, যদি ফিরেই যাবে, তাহলে একদিন যে ওদের বাড়ি হবে, তার নাম কেন রেখেছে 'চারু নিকেতন'?

আট

কাল যাননি। আজ সকালেই বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। পরেশবাবু আগে থেকে কিছু বলেননি বাড়িতে। বললে ভোর থেকেই রান্নাবাড়ার ঝামেলা। ওঁর স্ত্রী বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি? পরীক্ষা শুরু হয়েছে নাকি?'

পরীক্ষা নয়, বিশেষ কাজে যাচ্ছি।'

'কী কাজ? বোর্ডের অফিসে?'

'না। স্কুলের একটা ছাত্রকে খুঁজতে।'

'মানে?'

'সে এক ঘটনা। জানি না, কী সংবাদ নিয়ে আসব। আমি তো ওর বড়দাকে ভাল সংবাদ দেব বলে এসেছি।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' এবার সত্যিই কেমন লাগে।

'রতন নামে ক্লাশ এইটের একটা ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।'

'তাদের বাড়ির লোক তো আছে!'

'থাকলেও সব ক্ষেত্রে হয় না। ওর বাড়ির লোক তেমন নয়। বস্তিতে থাকে।'

'আরও তো স্যার—।'

পরেশবাবু কথা কেড়ে বললেন, 'বীনা, সব কিছুতে হিসেব কষলে হয় না। ছেলেটা অত্যন্ত মেধাবী। তা ছাড়া ও আমার প্রিয় ছাত্র। হাতের লেখা যা সুন্দর না!'

পরেশবাবুর স্ত্রী এবার একটু নরম। বললেন, 'কোথায় খুঁজতে যাচ্ছ?'

'কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায়।' তারপর হাসপাতাল।

'সে কী?' ফের অবাক হন পরেশবাবুর স্ত্রী।

'হ্যাঁ। এক মর্মান্তিক ঘটনা জেনে যাচ্ছি। দেখ, কালকের কাগজের সাতের পাতায় উপরের দিকে আছে খবরটা।'

'বলোই না।'

'রতনের বয়সী অচেনা এক ছেলে লরির তলায় চাপা পড়ে মারা গেছে। লাশ আছে সদর হাসপাতালে।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার। বলেন, 'আহা রে, কার মায়ের ধন—।'

'হেডমাস্টারই পাঠাচ্ছেন। তিনিও ভীষণ চিন্তায়। তাই বলছিলাম, কি সংবাদ যে আনতে যাচ্ছি!'

'সাবধান, পড়া থেকে ফিরে খোকা যেন জানতে না পারে। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে যা হোক কিছু বলে দিও।'

বীণাদেবী গেট পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। কাউকে কিছু বলে দিতে হল না, যেন কপালে হাত দুটো এমনিই উঠে এল তাঁর।

সকালবেলার শিয়ালদা স্টেশন। ডাউন ট্রেনগুলো ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক। সেই তুলনায় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন ফাঁকা। পরেশবাবুর হাতে স্কুলের ব্যাগ। জলের বোতল। গামছা লুঙি। বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত যদি রাত্রিবাস করতে হয় কোথাও। গাড়িতে ওঠার আগে হাফ পাউণ্ড রুটিও কিনে নিয়েছেন। দুটো কলা। বোধহয় আপাতত আর কিছু দরকার নেই।

জানালার ধারে বসেছেন পরেশবাবু। খুব একটা হইচই নেই। মাঝে মাঝে সুরেলা গলায় গাড়ির খবর বলছেন এক মহিলা। 'তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে যে গাড়ি আসছে সেটা কারশেড যাবে। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের গাড়িতে কেউ উঠবেন না।' হঠাৎ দেখেন একটা বাচ্চা ছেলে মালবাহকদের ট্রলিতে বাক্স নিয়ে যাচ্ছে। বাক্সের গায়ে লেখা এস. চক্রবর্তী। পরেশবাবু ভাবেন নিশ্চয় এ ড্রাইভারের বাক্স। কিন্তু বক্স-পোর্টার? জানালা দিয়েই, ময়লা জামা-প্যান্ট পরা স্কুলের ফাইভ সিক্সসের মতোই বয়স ওর।—এ কেমন ব্যাপার! শিশুদের দিয়ে সরকারি কাজ কেন? পরেশবাবু ব্যাগ রেখে গেটের কাছে এসে দেখেন সাদা পোশাক পরা লোকটার হাতে খাতা আর রেঞ্জের মতো কী যেন। নির্ঘাত ড্রাইভার। হ্যাঁ, গাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে

দেখলেন, আগে উনি উঠলেন তারপর বাক্সটা। খুব কষ্ট করেই ঢুকিয়ে ফেরত আসছে ছেলেটা। ট্রলির চাকায় শব্দ হচ্ছে। ঘড়ঘড় ঘড়ঘড়। গাড়িতে হুইসেল পড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিল। ছেলেটাকে দেখছেন। ও দু হাতে ঠেলে নিয়ে চলেছে ট্রলিটা।

সিটে বসে দু' একজনকে কথাটা বললেন। একজন বললেন, 'কোথায় অনাচার নেই বলতে পারেন?'

'তাই বলে শিশুদের দিয়ে এমন কাজ করাবে? পরেশবাবু ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন।

পরেশবাবুর কথা শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'মনে হয় কি জানেন, এইসব কর্মচারীদের গুলি করে—থাক বাবা, বাড়িতে বলে দিয়েছে পথে ঘাটে যেন বেশি বকবক না করি?'

গাড়ি এখন খালের ব্রিজ পেরোচ্ছে। 'আপনি তো দেখছি রসিক লোক মশাই!'

'আরে দাদা, ওইটুকুই তো আছে। এসব না থাকলে কবেই মিশরের মমি হয়ে যেতাম।—ছাড়ুন ওসব।' ভদ্রলোক আবার বলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই গভর্ণমেণ্টের সার্ভেণ্ট নন!'

'একেবারে নয় বলি কী করে।'

পরেশবাবু আর কিছু বলতেন তার আগেই কথা কেড়ে ভদ্রলোক বলেন, 'তা হলে স্যারগিরি করেন।'

'কী করে বুঝলেন?'

'আরে দাদা, মাস্টারমশাই আর উকিলবাবুদের ব্যাগ সাধারণত একরকম। আর আপনি যে শিক্ষক, ধুতি পাঞ্জাবি আর ওই কলমটাই বলে দিচ্ছে।'

হাসেন পরেশবাবু। যাক, এতটা পথে একজন অন্তত সঙ্গী হল।

'বিড়ি না সিগারেট?'

পরেশ স্যার মাফ চাওয়ার ভঙ্গি করতেই ভদ্রলোক নিজেই ধরালেন। বলেন, 'স্কুল কোথায়? প্রত্যেকদিনই কি আপনার আটটা সাতচল্লিশ?'

'না দাদা, আমি কলকাতায় শিক্ষকতা করি। যাচ্ছি একটা বিশেষ কাজে।'

'পাত্র না পাত্রী?'

দমবার পাত্র নন ভদ্রলোক। চেহারায় সপ্রতিভ ভাব। স্বীকার করতেই হয় প্রাণ আছে লোকটার মধ্যে। সোজাসুজি বলেন, 'স্কুলের একটা ছেলে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। ওর সন্ধানেই যাচ্ছি।'

'বয়স কত?'

'কত আর? বছর চোদ্দ—।'

'ঠিক ধরেছি!'

'মানে? পরেশবাবু ভ্রূ কুঁচকে তাকান।

'মনে মনে এই বয়সটাই ভাবছিলাম।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।'

'আরে এটাই তো পালাবার আদর্শ বয়স। ও ঠিকই করেছে।'

'বলেন কী?'

'আমি বেঠিক কিছু বলি না।'—বলেই অনেকটা নাটক করার মতো কায়দা করে বললেন, 'ভাবুন তো আপনার ছেলেবেলার কথা?—কী, পালাননি।'

পরেশবাবু নির্বাক।

'মনে করে দেখুন। পালাননি? অন্তত মনে মনে, কিংবা স্বপ্নের মধ্যে?'

পরেশ স্যারের কিছুই বলার নেই। এমন সত্যি কী সহজভাবে তুলে আনলেন ভদ্রলোক। 'আসলে কৃষ্ণনগরে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে কাল। কাগজে বেরিয়েছে। বয়স আর চেহারায় অনেকটাই মিল। তাই—।'

এবার ভদ্রলোক থেমে গেলেন। আর একটা কথাও বলেননি নিজের স্টেশনে নামার আগে পর্যন্ত। পরেশবাবু ডাকলেন, 'ও দাদা।' ভদ্রলোক যেন শুনতেই পাননি। দুর্ঘটনার কথায় অমন চুপচাপ হয়ে গেলেন কেন?

□

এদিকে রতনের এক ছাত্রীর মা সকালবেলায়ই মেয়েকে সঙ্গে করে রতনদের বাড়ি এলেন। বউদিকে বললেন, 'দিদি, রতন কি নিখোঁজ?'

লুকনোর চেষ্টা না করে মাথা নাড়েন। কেনই বা লুকোবেন!

'কতদিন হল?'

'প্রায় এক সপ্তাহ।'

মেয়েটি বলে, 'রতনদার নাম করে কাল রাত্তিরে রেডিয়োতে বলছিল। চোদ্দ বছরের একটি ছেলে। বাঁ চোখটা ছোট। রোগা পাতলা, গায়ের রঙ কালো। সন্ধান জানাবার ঠিকানা—। এইসব বলছিল রেডিয়োতে।'

রেডিয়োতে নাম বলেছে শুনলে কেমন একটা করার কথা। কিন্তু কারও তেমন ভাবান্তর নেই। লালু-ভুলুও এই সময় ঘরের মধ্যে জোরে জোরে বই পড়া শুরু করে দেয়। রতনের বড়দা নাইট ডিউটি দিয়ে আজ সোজা ঘরে ফিরে এসেছেন। দেওয়ালে হেলান দিয়ে পাখা হাতে ঝিমুচ্ছিলেন। বাবাকে ঠেকানো যায় না। শত দুর্যোগেও লঙ্কার দোকান নিয়ে বসবেনই। বলেন, 'একদিন কামাই দিলে জায়গা দখল হয়ে যাবে।'

বউদি খুব নিস্পৃহভাবে বলেন, 'বসবেন, দিদি?'

উত্তরে মেয়েটির মা জানতে চান, 'কীভাবে নিখোঁজ হল?'

এবার নিরুত্তর বউদি।

মেয়েটি বলল, 'ছেলেধরারা নিয়ে গেছে?'

'তা হবে কেন, রাগ করেছে। গেছে কোথাও। আবার ফিরে আসবে।'

'আমরা একদমই জানতাম না। রোজই ভাবি, এই আসবে। খবরটা শুনে তাই এলাম।—এখন যাই।'

'রতন ফিরুক, ওকে নিয়ে আর একদিন আসবেন।'

মেয়েটি বলল, 'আসব'।

ওরা চলে যেতেই বড়দা বললেন, 'জানো, মন বলছে রতন আজ ফিরবে। ওদের স্কুলের বাহাদুরও বলল, পরেশবাবু আজ যাবেন। হয়তো চলেও গেছেন এতক্ষণ। আমি একটু স্টেশনের দিকে যাই।'

'এখনই যাবে?'

'হ্যাঁ। খবরে বলেছে। দেখবে, কেউ একজন ওকে দিয়ে—।' কৃতজ্ঞতায় মাথা দুলিয়ে আবার বলেন, 'আরে মালিক দেশের লোক। ছবি নিয়েছিলেন কি আর এমনিই?'

বউদি জানতে চান, 'স্টেশন কেন? ও কি ওখান দিয়েই আসবে?'

'তুমি বুঝবে না ওসব। কোনও দিন যদি ট্রেন লাইন বন্ধ থাকে তো কলকাতা হাফ-হরতাল মনে হয়। খুঁজতেই যদি বেরোই, বেশি মানুষের



লঙ্কা বেচার নামে...একজনকে খুঁজে ফেরা।

মধ্যেই খোঁজা ভাল।'

এমন যুক্তির পাশে বউদি অন্য কিছুই বলেন না। শুধু বললেন, 'আমি তো এ শহরের সব কিছু বুঝি না!'

পড়া থামিয়ে লালু হঠাৎ বলে উঠল, 'বাবা, কাকা আজ আসবে?'

অনেকদিন পরে নিঃশব্দ হাসি বড়দার ঠোঁটে। বললেন, 'দেখি!'



স্টেশনের বড় কোলাপসিবল গেটের পাশে বসে আছেন বাবা। পাশে চটে মোড়া লঙ্কার পুঁটুলি। তাঁর মেজ ছেলের মতো এক চেকার গেটের পাশে দাঁড়িয়ে। বাবার ওই উঁকি ঝুঁকি দেওয়া দেখে। 'এই বুড়ো, হটো—।'

বাবা সরে বসেন।

'এখানে না, দূরে যাও। এটা ভিক্ষের জায়গা নয়।'

'আমি ভিক্ষেয় আসিনি বাবা। ছোট ছেলেকে খুঁজছি।'

'কী!' খুব বিরক্তি দেখিয়ে, কেমন একটা চোখে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল চেকারটা।

'হ্যাঁ বাবা, সত্যিই বলছি। আমার রতন—।'

'বুঝেছি, সরে বসো।'

খুব খারাপ লাগল বাবার। সব কথা শুনতেই চাইল না! আরও কতদিন এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু অন্য চেকাররা তো কই, কিছু বলেনি! এখানে এসে দেখছেন, কত ছোট ছোট ছেলেরা কাজে আসছে। হাতে টিফিন-বাক্স। আবার রাতে দৌড়ে দৌড়ে ট্রেন ধরা। কী পরিশ্রান্ত মুখ! একদম রতনের মতো।

এই জায়গায় বসেই গ্রামের সুরেশের সঙ্গে দেখা একদিন। ছেলেদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেছিল। মালপত্র নামাচ্ছিল ট্যাক্সি থেকে। ভীষণ সুখী জীবন। সুরেশের গলার স্বর আর দেশের টান শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন। শুনেছেন তার এখন দোতলা বাড়ি, ছেলেদের ভাল ভাল চাকরি। বাবা হাত চেপে ধরায় সুরেশ প্রথমে চমকে উঠেছিল। পরে চিনেছে। বলছিল, 'এ কী চেহারা হয়েছে দাদা?—এখানে কোথায়?' বলতে বলতেই ওর বউমা 'বাবা, ট্রেন ফেল হয়ে যাবে বলে', তাড়া দেওয়ায় আর কথা হয়নি।



'কোথায় যাবি খোকা?'

আর ভাল লাগছে না। সারা সকাল ফুটপাথে বসে দোকান তারপর লঙ্কা বেচার নামে স্টেশনে এসে হাজার হাজার মুখের মধ্যে একজনকে খুঁজে ফেরা। সত্যিই শরীর পারে না। একজন খদ্দের না বললে হয়তো এখানে রোজ আসতেনই না। সে বলেছিল, এতবড় কলকাতায় কোথায় খুঁজবেন ছেলেকে? তার চেয়ে স্টেশনের সামনে বসে থাকুন। একদিন না একদিন দেখা পাবেনই। কথাটা মজা করে বলা কি না কে জানে! তবে কাল শুনেছেন রতনের স্কুলের স্যাররা খুঁজছেন। বড় ছেলের মালিকরাও খুব চেষ্টা করছে। তাই বাড়তি হিসেবে নিজের চোখে খোঁজাটা মন্দ কী! কেউ না কেউ, কোথাও থেকে একদিন খুঁজে পাওয়া যাবেই রতনকে।

□

রতন এখানে একেবারে খারাপ নেই। কল্যাণী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঘুমিয়ে থাকে সে। স্টেশনের পুলিশরা কোথা থেকে একটা জামা-প্যান্ট দিয়েছে তাকে। বড় হয়েছে একটু। খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না তাতে। শিমুরালি থেকে পালানোর পর সেই রাতে কিছুই খায়নি। বাবার মতো একটা লোক ওর শুয়ে থাকা দেখে কেন জানি কাছে এসে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কোথায় যাবি খোকা?'

'কোথাও না। এখানেই থাকব। তুমি কে?'

'কেউ না। এমনিই জিজ্ঞেস করছি।'

রতন চুপ করে থাকে।

'কী করব! পয়সাকড়ি নেই! কিছু খেতে দেবে?'

বৃদ্ধ মানুষটি তার ছোট ঝুড়ি থেকে একমুঠো পানিফল দিয়ে বললেন, 'আমি বিল থেকে তুলে বাজারে দিই। একটা মানুষের চলে যায়।—তুই সাঁতার জানিস?

'হ্যাঁ।'

'তা হলে চিন্তা কীসের? লেগে পড়। পানিফল তুলে বিক্রি। খেয়েদেয়ে দেখিস, কিছু পয়সা থাকছেও।'

সত্যি। লোকটাকে যেন ভগবানই তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রতন অবশ্য বাজারে দেয় না। কল্যাণী স্টেশনে দাঁড়িয়েই বিক্রি করে।

কখনও-সখনও গাড়িতে ওঠে। তবে লুকিয়ে-চুরিয়ে। কয়েকজন হকার পানিফল, পদ্মফুলের চাক বিক্রি করায় তাকে মারতে গেছিল। তাই গাড়ি ঢুকলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই হাঁক পাড়ে, 'চাই পানিফল...পদ্মের চাক চাই।'

ট্রেনের কেউ ডাকলে তবেই ওঠে। বিক্রি করে পরের স্টেশনে নেমে পড়া। আবার ফিরে আসা। খারাপ লাগছে না কিন্তু। তবে লালু-ভুলুর জন্যে মাঝে মাঝেই মনটা খুব পুড়ছিল। মনে পড়ছে ছাত্রদের কথা। ওদের মা বাবা ধরেই নিয়েছে তাদের রতনদা আর পড়াবে না। স্কুলের পাপু, দেবুরা কি জেনেছে তার কথা? দেবু হয়তো ভাবছে, যাক, এবার ক্লাশে ওঠার পরীক্ষায় একজনের বাধা পার হওয়া গেল।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল রতন। লাস্ট ট্রেন চলে যাবার পরও রেল লাইনের বিশ্রাম থাকে না বুঝি। মালগাড়ি যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পুলিশদের জুতোর শব্দ। টর্চ ফেলে শুয়ে থাকা মানুষদের মুখ দেখা। তার মুখে আলো পড়তেই চোখ মিটমিট করছিল। 'কী রে, ঘুমোসনি?'

রতন হাসছিল।

'ঘুমো। রাত অনেক হয়েছে।' টর্চের আলো সরে গেল।

বিদ্যুৎ চমকালো না? এই তো ঠাণ্ডা হাওয়া। রতন ঘুমোতে চেষ্টা করে।

সান্যাল চর ভারী অদ্ভুত জায়গা। এমন একটা দ্বীপভূমির সন্ধান পাবে ভাবতেই পারেনি রতন। সান্যাল চরের খবর দেওয়া লোকটাকে তার দেবদূত বলেই মনে হয়। সেই যে বলে গেল, আর দেখতে পায়নি তাকে। ইচ্ছে আছে, বাজারে ফলের দোকানে খোঁজ নিয়ে দেখবে সত্যি সত্যিই লোকটার বয়সী কেউ এসে পানিফল কিংবা পদ্মের চাক বিক্রি করে কি না। যদি সত্যিই না আসে তা হলেই বিশ্বাস হবে সত্যিকারের দেবদূত এখনও আছে, যে মানুষের দুঃখের দিনেও অযাচিত হয়ে উপকার করতে আসে।

সকালে যখন চর-লাগোয়া জলে সাঁতার দিয়ে পানিফল তুলছিল, সেই ঘাটে তার মায়ের বয়সের একজন এসে অনেকক্ষণ একা দাঁড়িয়ে দেখছিলেন পানিফল তোলা। সাঁতরে সে অনেক দূর যেতে পারছিল। যত দূর ততই পানিফল আর পদ্মফুলের চাক যেন ঘন হয়ে আছে। সঙ্গী তার ছোট কলার ভেলা। ভেলা নিয়ে পানিফলের জঙ্গলে ঢুকলেই জড়াঘটা পাকিয়ে যায়।

যখন ফিরে এল, ওই মা জানতে চাইলেন, 'তুই কোথায় থাকিস বাবা?'

'কল্যাণী স্টেশনে।'

'সঙ্গে আর কে আছে?'

'কেউ না। আমি একা।'

'মা বাবা?'

রতন কলার ভেলাটা টানতে টানতে আঘাটার জঙ্গলে ঠেলে দিয়ে বলল, 'মা নেই। বাবা দাদারা অনেক দূর। এখানে এসেছি কদিন হল। দুটো পয়সা জমিয়ে বাবাকে দিয়ে আসব।'

কেমন করে যেন চেয়ে আছেন এই মা-টা। যেমনই থাকুন, রতনের বিশ্বাস, ওঁর তাকানোটা খারাপ চোখের নয়। রতনই বলল, 'পানিফল তুললে কেউ কিছু বলবে?'

'না। বলবে না। কিন্তু কদিন ধরে তোকে একটা কথা বলব বলে ভাবছি।'

জলে সে নামে গামছা পরে। ছোট্ট খেজুর গাছে ঝুলিয়ে রাখে প্যান্টটা। এবার ভেজা গামছার ওপর প্যান্টটা পরতে পরতে বলে, 'কী বলবে, মাসি?'

'তুই বাবার কাছেই ফিরে যা।'

'এ কথা বলছ কেন?'

'এমনি। তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই ঘর-পালানো ছেলে। সত্যি কথাটা বল তো।' কাছে এসে রতনের গা ছুঁয়েই বললেন কথাটা।

রতন শুনল। কিছু বলল না।

পঁচিশ পয়সা দিলেই সান্যাল চরের মনসাতলা থেকে শিমুরালির ঘাট পর্যন্ত নৌকোয় পৌঁছে দেয়। জলের মাঝখানে এলে পরিষ্কার বোঝা যায় একটা বড় আকারের ঢিপি জলের মাঝখানে উঁচু হয়ে জেগে আছে। নারকেল, সুপুরি আর নানারকম গাছের মধ্যে একটা দুটো টালির ঘরও উঁকি দেয় যেন—। ছোট্ট পৃথিবীর মধ্যে ছোট্ট এক গ্রাম। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে। আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে। ওই মা-টা কি এখনও সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে? এই নৌকোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন তাকে?

থলেভর্তি পানিফল আর পদ্মচাক। এত পেয়ে যাবে আজ ভাবতেই



রোজকার মতো আজও প্যান্টটাকে রাখে খেজুর গাছের গায়েই।

পারেনি রতন। ভীষণই খুশি লাগছে। টাইট করে বাঁধা আছে থলের মুখ। চরের কূল থেকে উঠে স্টেশনের পথ সে ধরে না। মন্দির-লাগোয়া পথ ধরে রতন হেঁটেই মদনপুর স্টেশনে ওঠে। শিমুরালি গেলে ধরা পড়তে পারে। তিলক কি ওখানে এসে খোঁজ করে এখনও? ও কি স্টেশনের ছেলেগুলোর কাছে টাকা পেয়েছিল? ঘড়িটা ছাড়িয়েছে? রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় সময়ই তার কথাগুলো উঁকি দেয়। মনটা কেমন হয়ে যায় তখন।

থলে থেকে অবিরত জল চুঁইয়ে পড়তেই থাকে। রতন হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে আজ এতটাই মগ্ন যে মদনপুর স্টেশনে ওঠার কথা মনে পড়ে না। পাশ দিয়ে এক রাস্তা। কল্যাণী, কাঁচরাপাড়া শ্যামনগর কাঁকিনাড়া...। বউদির মুখ। লালু-ভুলু, দেবু, পাপু পরেশ স্যার। সবার শেষে বাবার চেহারা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

প্যান্ট খুলে গামছা পরে নেয় রতন। রোজকার মতো আজও প্যান্টটাকে রাখে খেজুর গাছের গায়েই। শুকনো গামছা জলে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে, টেরই পায় না সে। ওই মা-টা কেন বললেন ফিরে যাওয়ার কথাটা! মুখটা কিন্তু অনেকটাই তার মায়ের মতো দেখতে। সত্যি বলতে, তার নিজেরও মনটা ভাল নেই। ঘুম নেই। পুলিশরা যতবারই আসুক, টর্চের আলোয় দেখবে, তাদের রতনের চোখ পিটপিট বন্ধ হয়নি। লাস্ট ট্রেনের পর কটা মালগাড়ি গেল তাও বলে দিতে পারবে সে।

রতন কল্যাণী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থলেটা নামিয়ে ভাবল, না, আর ভাল লাগছে না। ওই মায়ের কথাই হয়তো ঠিক। যেন কতদিন লালু-ভুলুর গলা শোনা হয়নি—কাকা, স্কুলে যাবে না? বেলা হয়ে গেল যে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাউন ট্রেনের খবর হবে। থলেটা আবার কষ্ট করে তুলল। চুপিচুপি পুলিশদের দরজার পাশে রেখে টিকিট কাটতে ছুটল রতন।

□□

Laser typeset at Ess Ess Enterprises, New Delhi-110 055
and printed at Beauty Print, New Delhi-110 055